দেখিয়া আমরা যার পর নাই আহ্লাদিত হইলাম। ইহার ভূমিকা বেশ পাণ্ডিত্য-পূর্ণ অথচ স্ত্রীজনোচিত হইয়াছে। প্রস্তাব সকলও পূর্ব্বানুরূপ হইয়াছে। আমরা সম্পূর্ণ আশা করি সম্পাদকীয় হস্ত পরিবর্ত্তনে ভারতী ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন না। আজি কালি কৃতবিদ্যা বঙ্গাঙ্গনাদিগের সংখ্যা বাড়িতেছে, তাঁহারা সাহসপূর্ব্বক কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া আপনাদিগের যোগ্যতার পরিচয় দেন, ইহা নিতান্ত প্রার্থনীয়।

ট্রাবাঙ্কোরের মহারাজ গবর্ণমেণ্টের হস্তে ৬০০০ টাকা দিয়াছেন। ইহাতে মান্দ্রাজ মেডিকেল কলেজের হিন্দু ছাত্রীদিগকে ৪ বৎসরের জন্য মাসিক ১৫ টাকা করিয়া বৃত্তি দেওয়া হইবে। বঙ্গদেশে এরূপ বৃত্তি স্থাপনের অধিক প্রয়োজন।

পুনা নগরে দেশীয়া স্ত্রীলোকদিগের উচ্চ শিক্ষার্থ একটী বিদ্যালয় স্থাপিত হইবে, লেডী রিপণ তদর্থে ১০০০ এক হাজার টাকা দান করিয়াছেন এবং পুনার জজ ওয়োডরবরণ ১০০০০ টাকা দিয়াছেন।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর বেল্লারী নামক স্থানে বহুসংখ্যক হিন্দু শ্রোতার সমক্ষে পণ্ডিত বুচিয়া পাণ্টালু বিধবা-বিবাহের আবশ্যকতা বিষয়ে এক বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতা এরূপ হৃদয়স্পর্শী হইয়াছিল যে সভাস্থলেই একজন ধনাঢ্য হিন্দু জ্ঞাপন করিলেন তৎপ্রদেশের যে ব্যক্তি প্রথম বিধবা-বিবাহ করিবেন, তিনি তাহাকে ১০০০ টাকা যৌতুক ও মাসিক ১৫৲ টাকা করিয়া বৃত্তি দান করিবেন।

বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ মধ্যে বিধবা-বিবাহের পুনরারম্ভ দেখিয়া আমরা আশান্বিত হইতেছি। সম্প্রতি নলডাঙ্গার রাজা প্রমথভূষণ দেবের উৎসাহে দুইটী বিধবা-বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। অনেক সম্ভ্রান্ত ও উচ্চপদস্থ লোক বিবাহ সভায় উপস্থিত থাকিয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন।

আজি কালি অনেক হিন্দু বালবিধবা ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় লইতেছেন। হিন্দু সমাজে বিধবাদিগের দুর্গতি দিন দিন যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে তাঁহারা আর নিজ অবস্থায় সন্তুষ্ট হইয়া থাকিতে পারিতেছেন না। ভদ্র বিধবাদিগের জন্য একটী কার্য্যালয় স্থাপিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। ইহা হইলে তাঁহাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় হয় এবং তাঁহারা নানাবিধ কার্য্য শিক্ষা করিয়া জনসমাজের অনেক উপকারে আসিতে পারেন।

স্থানান্তরে বঙ্গমহিলা সমাজের একটী গৃহ নির্ম্মাণের প্রার্থনা পত্র প্রকাশিত হইল। আমরা আশা করি স্ত্রীসমাজের এই হিতকর কার্য্যে সাধারণে যথাসাধ্য সাহায্যদানে বিমুখ হইবেন না।

দেবমন্দিরে স্ত্রী পুরুষের একত্র মিশামিশি হইয়া দুর্নীতির বৃদ্ধি না হয় এই উদ্দেশে চিনদেশের রাজকীয় গেজেটে এক অদ্ভুত রাজাদেশ প্রচারিত হইয়াছে :—

"সেন্‌সর ওয়েন হাইর বিবরণে প্রকাশ যে স্ত্রীলোকদিগের দেবমন্দির দর্শন হেতু সাধারণ নীতির অপভ্রংশ হইতেছে, এই জন্য তিনি এ প্রথা রহিত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। স্ত্রীলোক ও বালিকাদিগের মন্দিরে গমন করিয়া ধুনা ধুপ পোড়ান ইতিপূর্ব্বেই নিষিদ্ধ হইয়াছে। সেন্‌সরের লিপিপ্রমাণ স্ত্রীলোক ও বালিকাগণ রাজধানীর অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন দেবমন্দিরে গমনাগমন যদি পুনরারম্ভ করিয়া থাকে, তাহা অবৈধ এবং রাজধানীর কর্তৃপক্ষ তন্নিবারণার্থ ঘোষণাপত্র প্রচার করিবেন।

স্ত্রীলোকদিগের দেবমন্দির গমন এককালে নিষেধ করিয়া তাহাদিগের ধর্ম্মসাধনের ব্যাঘাত করা অন্যায়। তবে দুর্নীতি নিবারণার্থ স্ত্রী পুরুষ উভয়ের প্রতি সমান বিচার করিয়া ব্যবস্থা করা আবশ্যক। এদেশের তীর্থস্থান ও দেব মন্দির শাসনের আবশ্যকতা আমরা বিশেষ অনুভব করিতেছি।

জর্ম্মণির যে "ওলাউঠা কমিসন" ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের কৃতকার্য্যতা দেখিয়া তত্রত্য গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে ১ লক্ষ ২৫ হাজার (মার্ক) টাকা পুরস্কার দিয়াছেন। ইহার মধ্যে ১ লক্ষ মুদ্রা সভাপতি ডাক্তার কচকে প্রদত্ত হইবে। ইউরোপীয়দিগের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে যেরূপ অসাধারণ যত্ন, তৎপ্রতি রাজ সম্মানও সেইরূপ প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

মাদাগাস্কারের ভূতপূর্ব্ব রাজ্ঞীর ন্যায় বর্ত্তমান রাজ্ঞীও সুনীতির পক্ষপাতিনী। রাজ্যমধ্যে কোন প্রকার মাদকদ্রব্য প্রস্তুত, আমদানী বা বিক্রীত না হয়, এজন্য তিনি পুলিস নিযুক্ত করিয়াছেন। আমাদের গবর্ণমেণ্ট মাদকতার দমনার্থ একসাইজ কমিসন নিযুক্ত করিলেন, কিন্তু কার্য্যতঃ দমনের কি কোন উপায় করিবেন?

শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর ক্রফট্ সাহেব ৪০ টাকার একটী বার্ষিক পারিতোষিক রচনার বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, বিষয় "ইতিহাস পাঠের ফল কি?" কৃষ্ণনগরের ছোট আদালতের অন্যতম জজ বাবু ব্রজমোহন দত্ত রায় বাহাদুর বর্ষে বর্ষে এইরূপ পারিতোষিকদানের উপযুক্ত ফণ্ড স্থাপন করিয়াছেন। তৎসম্বন্ধে নিয়ম এই :—

(১) বাঙ্গালী যে কোন রমণী ইহার জন্য প্রতিযোগিতা করিতে পারিবেন, বয়সের কোন নিয়ম নাই।

(২) বাঙ্গালা বা সংস্কৃতে রচিত প্রবন্ধের জন্য পুরস্কার দেওয়া হইবে।

(৩) বিজ্ঞাপনের ৬ মাসের মধ্যে প্রবন্ধটী সেণ্ট্রাল টেক্সট বুক কমিটীতে পাঠাইতে হইবে। তাঁহারা পারিতোষিক পাইবার যোগ্য কে, তাহা নির্ব্বাচন করিবেন।

(৪) প্রত্যেক প্রবন্ধের সঙ্গে ২ লেখিকার স্বামী, পিতা বা অভিভাবক লিখিয়া দিবেন, যে তিনি যতদূর জানেন তাহাতে লেখিকা রচনা বিষয়ে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে কাহারও কোন সাহায্য গ্রহণ করে নাই।

প্রত্যেক রায় বাহাদুর ও রাজা মহারাজ এইরূপে আপনার আপনার নাম চিরস্মরণীয় করিলে দেশের কত মঙ্গল হয়!

সম্প্রতি বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় উত্তর পশ্চিম ও পঞ্জাব অঞ্চলে ভ্রমণ করিয়া তাঁহার অসাধারণ বক্তৃতাশক্তি দ্বারা সকলকে দেশহিতকর কার্য্যে উত্তেজিত করিয়াছেন এবং জাতীয় ধনভাণ্ডারে ২৫ হাজার টাকা স্বাক্ষরিত করাইয়াছেন। ফণ্ডে মোট ৭০ হাজার টাকা হইয়াছে।

স্ত্রীলোকদিগের কার্য্যক্ষেত্র।

বহুদিন হইতে সাধারণের এই সংস্কার ছিল, যে স্ত্রীলোকদিগের ক্ষমতা ও অধিকার কেবল গৃহের চতুঃসীমার মধ্যে। আজি কালি ইউরোপ ও আমেরিকা এ সংস্কার খণ্ডন করিতেছে। শ্রমজনক ও অর্থাগমোপযোগী কার্য্যক্ষেত্রের দ্বার যত স্ত্রীলোকদিগের জন্য উন্মুক্ত হইতেছে, ততই সপ্রমাণ হইতেছে যে তাঁহারা পুরুষদিগের সহিত সমক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া বিলক্ষণ প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ। তাঁহাদিগের কার্য্য অধিক পরিষ্কার এবং অল্পব্যয়ে সম্পন্ন হয়। ডাক, টেলিগ্রাফ, ও টেলিফোন বিভাগে ইহার যে পরীক্ষা হইয়াছে, তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ আমাদিগের পাঠিকাগণের গোচর করাই এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

৩০ বৎসর হইল প্রিন্স আলবার্টের অশ্বরক্ষক জেনারল উইলড়ি যখন জাতিমধ্য তাড়িতবার্ত্তাবহ কোম্পানির (Electric International Telegraph Co.) একজন অধ্যক্ষ ছিলেন, তার বিভাগে স্ত্রীলোকদিগকে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব ইংলণ্ডেশ্বরীর নিকট করেন এবং মহারাণী তাহাতে আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করেন। ১৮৫৩ সালে পরীক্ষাস্বরূপ সর্ব্বপ্রথম কয়েকটী বালিকাকে উক্ত বিভাগে লওয়া হয়, ক্রমে তাহাদিগের সংখ্যা যেরূপ বাড়িয়াছে, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। একণে লণ্ডনের সদর আফিসে ৬৫৭ এবং রাজধানীর ভিন্ন ভিন্ন অংশে

টেলিগ্রাফ ও পোষ্ট আফিসে ৩৫০ জন স্ত্রী-কর্ম্মচারী কার্য্য করিতেছেন। ১৮৭০ সাল হইতেই এই সংখ্যা অধিক পরিমাণে বাড়ে, ফসেটের হস্তে ইংলণ্ডীয় ডাকবিভাগের ভার অর্পিত হইয়া অবধি আরও অধিক বাড়িয়াছে। যে সহস্রাধিক কর্ম্মচারীর উল্লেখ হইল, তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের চিহ্নিত, তদ্ভিন্ন ৯০০ স্ত্রীলোক ভিন্ন ভিন্ন দোকান * প্রভৃতিতে ডাক ও টেলিগ্রাফের কাজ করিতেছেন। মফস্বলে লিবারপুল, গ্লাসগো ও মাঞ্চেষ্টার প্রভৃতি স্থানের পোষ্ট আফিসেও কার্য্য করিয়া অনেক রমণী জীবিকা লাভ করিতেছেন।

কর্ম্মপ্রার্থীদিগের পরীক্ষা বৎসরে দুইবার হয়, পরীক্ষক ওয়েষ্ট মিনিষ্টারের কনন রোর সিবিল সার্ব্বিস কমিসনরগণ। পরীক্ষার্থিনীদিগের বয়স ১৪ হইতে ১৮ বৎসর পর্য্যন্ত, পরীক্ষার ফি ১ শিলিং মাত্র। শ্রুতিলিখন, হস্তলিপি এবং অঙ্কের সামান্য ভাগ পর্য্যন্ত পরীক্ষা দিয়া যাঁহারা উত্তীর্ণ হন, তাঁহারা বিনা বেতনে পোষ্টাফিস টেলিগ্রাফ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে পারেন। ৩ মাস পাঠের পর নিম্নতম কর্ম্মচারীর পদ প্রাপ্য, তাহাতে বেতন সপ্তাহে ১০ সিলিং অর্থাৎ মাসে প্রায় ২৫ টাকা। কর্ম্মচারীরা প্রথম কয়েকমাস পরীক্ষাধীন থাকেন, কাজের উপযুক্ত বলিয়া প্রতীত হইলে সপ্তাহে ২৭ শিলিং অর্থাৎ মাসে প্রায় ৭০ টাকা পর্য্যন্ত বেতন বাড়িতে পারে। অনেকে শীঘ্র শীঘ্র বিবাহিত হইয়া কর্ম্ম ছাড়িয়া দেন, এজন্য তত টাকা বেতনের অপেক্ষা করিতে পারেন না। কিন্তু অনেকে আবার বহু দিন থাকিয়া ক্রমশঃ পদোন্নতি লাভ করিতে থাকেন। যথা টেলিগ্রাফ আফিসে ২য় শ্রেণীর কর্ম্মচারী ৪২৪ জন, ইঁহারা সপ্তাহে কেহ ১০, কেহ ১২ শিলিঙে আরম্ভ করিয়া এক বৎসরে সপ্তাহে ১৭ শিলিং হিসাবে পান। তৎপরে সপ্তাহে ১ টাকা করিয়া বৃদ্ধি হইয়া বৎসরান্তে পূর্ণমাত্রায় অর্থাৎ প্রায় ৭০ টাকা মাসিক বেতন পান। ১ম শ্রেণীর কর্ম্মচারী ১৯৬ জন, তাঁহারা সপ্তাহে প্রায় ১৮ হইতে ২৫ টাকা বেতন পান। ১৫ জন সহকারী পরিদর্শিকা (Asst. Supervisor) বর্ষে ১০০০ । ১২০০ টাকা করিয়া পান। পরিদর্শিকারা ২০০০ । ২৫০০ টাকা করিয়া বেতন পান। সর্ব্বোপরি আফিসের কর্ত্রী বা লেডি সুপারিটেণ্ডেণ্ট বর্ষে প্রায় ৩০০০ টাকা বেতন পান। প্রতিবর্ষে শতাধিক মুদ্রা করিয়া তাঁহাদের বেতন বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

স্ত্রী কর্ম্মচারীদিগকে প্রাতে ৮টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত আফিসে থাকিতে হয় এবং প্রতিদিন ৮ঘণ্টা কাজ করিতে হয়। এই সময়ের মধ্যে কাহারও অন্যত্র যাইবার

* ইংলণ্ডে দোকানদারেরা, কিছু কিছু কমিসন লইয়া ডাক ও টেলিগ্রাফের কাজ চালাইয়া থাকে।

নিয়ম নাই। পুরুষদিগের জন্য যেমন স্ত্রীলোকদিগের জন্যও সেইরূপ দুইটী বৃহৎ ভোজগৃহ আছে, তথায় তাঁহারা মধ্যাহ্ন-ভোজন সম্পন্ন করেন। যাঁহারা সকাল সকাল আসেন, চা ও প্রাতর্ভোজন বিনা মূল্যে পান। পরিবেশন করিবার জন্য ২৪ জন পরিচারিকা নিযুক্ত আছে। সময় সময় রবিবার কাজ করিতে হয়, কিন্তু রাত্রি ৮টার পর কাজ করিতে কেহ বাধ্য নন। এই স্ত্রীলোকেরা ভদ্রকুলোদ্ভবা, এজন্য অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত তাহাদিগের বাটীর বাহিরে থাকায় তাঁহাদিগের মাতারা কখন সম্মত হন না।

স্ত্রীলোকেরা পুরুষদিগের সহিত একগৃহে বসিয়াই কাজ করেন—কোথাও সকলেই স্ত্রীলোক, ২। ১ জন পুরুষ, কোথাও ঠিক তাহার বিপরীত। প্রত্যেকে আপনার ২ কার্য্যেই ব্যস্ত হইয়া থাকেন। স্ত্রী কর্ম্মচারীদিগের দৃশ্য বড় সুন্দর, তাঁহারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া সম্মুখে পুষ্পপাত্রাদি সজ্জিত রাখিয়া কার্য্য করিতে থাকেন। পুরুষদিগের অপেক্ষা তাঁহাদিগের অনুপস্থিতির পরিমাণ কিছু অধিক হয়, কিন্তু অনেক স্থলে তাহা তাঁহাদিগের গৃহের বন্দোবস্তের দোষে। যাহা হউক টেলিগ্রাফ ও ডাক বিভাগের কার্য্যে স্ত্রীলোকদিগের যে বিশেষ আকর্ষণ হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই, ৫০টী কর্ম্ম খালি হইলে ৫০০ দরখাস্ত পড়িয়া থাকে। অধিক বয়স পর্য্যন্ত যাঁহারা কার্য্য করেন, তাঁহারা পেন্সন পান, ১০ বৎসরের ন্যূন কার্য্য করিলে অবসর দিবার সময় পুরস্কার দেওয়া হয়, এটীও আকর্ষণের অন্যতর কারণ।

৩ বৎসর হইল ইউনাইটেড টেলিফোন কোম্পানি স্ত্রী কর্ম্মচারী নিয়োগ করিতে আরম্ভ করেন। ব্যয়সংক্ষেপই এইরূপ ব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু ইহাদ্বারা তাঁহারা আর এক বিষয়ে লাভবান হইয়াছেন। বালকের কণ্ঠস্বর অল্পদিনে মোটা ও কর্কশ হইয়া কার্য্যের ব্যাঘাত হইত, বালিকার কণ্ঠস্বর বরাবর মিষ্ট ও পরিষ্কার থাকে, ইহাতে কার্য্যের সুবিধা হইয়াছে। যাঁহারা টেলিফোন কার্য্যে নিযুক্ত হন, তাঁহাদিগের অধিকাংশের বয়স ১৬ ও ২২ র মধ্যে। ইহার জন্য পূর্ব্বে কোন পরীক্ষা দিতে হয় না। কর্ম্মচারীরা সপ্তাহে ১০। ১২ কখনও ১৫। ২০ টাকা করিয়াও বেতন পান। কার্য্যের সময় প্রাতে ৯টা হইতে অপরাহ্ণ ৬টা বা প্রাতে ১০টা হইতে অপরাহ্ণ ৭টা। দুইজন বালিকা লইয়া কার্য্য আরম্ভ হয়, এখন কর্ম্মচারীর সংখ্যা শতাধিক হইয়াছে। সমুদায় আফিসের কর্ত্রী বা লেডি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বিবি মার্লিনের মতে বালিকারা এ কাজে বেশ সন্তুষ্ট ও অনুরাগী। তাহাদিগের পীড়ার সংবাদ প্রায় পাওয়া যায় না। কিন্তু তাহাদিগকে সমস্ত দিন বকিতে হয়। ইহাতে একটা উপকার হইয়াছে,

বাজে গালগল্প লইয়া যে সময় যাপন করিত, আর তাহা করিতে পারে না। আফিসের দৃশ্য বড় কৌতুকজনক। বালিকা ও যুবতীরা এক এক ছোট আলমারীর সম্মুখে গর্ত্তের মধ্যে মুখ দিয়া কেবল কিচির মিচির করিতেছে এবং মস্তকের উপর এক একটা কাষ্ঠময় উপকর্ণ ধরিয়া আছে। ইহা দেখিয়া কেহ হাস্য সংবরণ করিতে পারেন না। কিন্তু হাস্য করিলে কি হইবে? টেলিফোন সভ্যতার অপরিহার্য্য সহায় এবং ইহা স্ত্রীলোকদিগের উপজীবিকার একটী উৎকৃষ্ট উপায় বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

মাতার প্রভাব।

বাটীর সকলে আজ মহা ব্যস্ত। ভৃত্যেরা ক্রমাগত আসা যাওয়া করিতেছে। গৃহিণীকে এটা ওটা আনিয়া দিতেছে। বাক্স সিন্দুক নানা দ্রব্যে পূর্ণ করিয়া মাতা নিকটবর্ত্তী বিশ্বস্ত ভৃত্যকে সে সকল সাবধানে রাখিতে আদেশ করিয়া গৃহান্তরে গমন করিলেন। প্রভাত হইবা মাত্র তাঁহার একমাত্র পুত্র সতীশচন্দ্র বিদেশ গমন করিবেন, আবার কতদিন পরে তাঁহাকে দেখিতে পাইবেন—অপরিচিত স্থানে কখন কি হয়, এই ভাবিয়া জননী আজ অস্থির! মধ্যে মধ্যে চক্ষের জল মুছিতেছেন আর সতৃষ্ণভাবে এক একবার উন্মুক্ত গবাক্ষদ্বারে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। ধার্ম্মিকা মাতার যত্নে সতীশ অতি শৈশব হইতেই নানা সদুপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছে—কিন্তু হায়! মাতার এত যত্ন ও পরিশ্রমের সার্থকতা কোথায়? অবাধ্য সন্তান মাতার সকল কথা অগ্রাহ্য করিয়া কুসঙ্গীদিগের পরামর্শে যথেচ্ছাচারী। সময় সময় মাতার সেই পবিত্র স্নেহময়ী মূর্ত্তি তাহার অসাধু ইচ্ছার সম্মুখে ছায়াবৎ উপনীত হইয়া তাহাকে অসাধু প্রতিজ্ঞা হইতে বিচলিত করে বটে, কিন্তু অনতিবিলম্বেই সঙ্গীদিগের প্ররোচনায় সে ভাব স্থায়ী হইতে পারে না। মাতার এমনি স্নেহ যে কিছুতেই তাহা বিনষ্ট হইবার নহে। উদ্ধত অত্যাচারী সন্তান এত কষ্ট দিতেছে, কিন্তু সে কি কিছুতেই মাতার যত্ন চেষ্টাকে পরাজিত করিতে পারিতেছে? গভীর বিষাদের তীব্রতা মাতার হৃদয়কে ম্লান করে বটে, কিন্তু যে অটল ঈশ্বরভক্তি মানবের প্রাণকে স্বর্গের দিকে আকৃষ্ট করে, সেই ভক্তি ও বিশ্বাসে ভর করিয়া জননী আপন শোকভারাক্রান্ত মস্তক উত্তোলন করেন। মাতার প্রার্থনা অবিচলিতভাবে কেবল সন্তানের মঙ্গল কামনায় নিযুক্ত।

জননীর ইচ্ছা পুত্র নিকটে থাকিয়া

কাজ কর্ম্ম করে, কিন্তু সন্তানের ইচ্ছা তাহার বিপরীত। সে বিলক্ষণ বুঝিত মাতার নিকট সে কত অপরাধী। কখন কখন ইচ্ছা হইত "জননীর চরণ প্রান্তে পতিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করি, কুসঙ্গীদিগকে বিদায় দিয়া জননীর ও ভগিনীর পবিত্র সহবাসে দিন অতিবাহিত করি," কিন্তু হায়! প্রলোভনের এমনি মোহিনী শক্তি, যে সৎ প্রতিজ্ঞা উদয় হইতে না হইতে নীচ কামনা সকল প্রবল হইয়া হৃদয়কে বিপরীত দিকে আকৃষ্ট করিয়া ফেলিত।

রাত্রি দ্বিপ্রহর, জগৎ নিস্তব্ধ, এমন সময়ে আলোক হস্তে জননী পুত্রের শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলেন। ধীরে ধীরে শয্যাপার্শ্বে উপনীত হইয়া স্বীয় পুত্রের সুকুমার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ক্রমে ক্রমে বসিয়া পড়িলেন, তাঁহার নয়ন জলভারে স্তম্ভিত হইল, হৃদয় উদ্বেগে পূর্ণ হইয়া গেল। নিশাবসানে তাঁহার হৃদয়ের ধনকে আর দেখিতে পাইবেন না—এ চিন্তা প্রাণকে ব্যাকুল করিল। কিন্তু অবাধ্য সন্তান বিদেশে কুসঙ্গে পড়িয়া আরও উচ্ছৃঙ্খল হইবে ইহা ভাবিয়া মাতার অন্তরের অন্তরে যে বিষমভাব উপস্থিত হইল তাহা কাহার সাধ্য বর্ণনা করে। জননী আর থাকিতে না পারিয়া নিমীলিত নয়নে উর্দ্ধকরে বলিলেন "জগদীশ! তোমার ইচ্ছা ধন্য হউক, আজ সন্তান আমার নিকট হইতে দূরে যাইবে বটে, কিন্তু জানি প্রভো তুমি সন্তানকে কখনও পরিত্যাগ কর না। তোমার সন্তানকে আশীর্ব্বাদ কর। আমার চেষ্টা সফল হয় নাই সত্য, কিন্তু হে দেব! তোমার আশীর্ব্বাদ কখনও নিষ্ফল হয় না।" আর বাক্য সরিল না। চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া গেল।

সতীশ হঠাৎ জাগরিত হইয়া দেখে সেই পবিত্র মূর্ত্তি তাহার শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট—সে আর থাকিতে পারিল না, মাতার হৃদয়ে মস্তক লুকাইল। ক্ষণ কালের মধ্যে নিজের সমুদয় পাপ এবং অপর দিকে পুণ্য পবিত্রতার আদর্শ সেই স্নেহময়ী জননীর চিন্তায়, তাহার চিত্ত একেবারে গলিয়া গেল, মাতার অশ্রুতে সন্তানের অশ্রু মিশ্রিত হইল, পুণ্যের নিকট অনেকদিনের পাপাসক্ত হৃদয় আজ পরাজিত হইল। কাতর ভাবে সন্তান মাতার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিল। জননীর চক্ষের জল তাহার অন্তস্তল ভেদ করিয়া আজ তাহাকে যেন জাগরিত করিয়া দিল, সুষুপ্ত জগৎ আবার জাগিয়া উঠিল। পূর্ব্বাকাশে উষার আরক্তিম ছটা দেখা দিল। অন্ধকারের পর আবার যেন জগৎ হাসিল, কিন্তু হায়! মাতার হৃদয়ের যে বিষম উৎকণ্ঠা তাহা কিছুতেই অপনীত হইল না।

ক্ষণকাল পরে পুত্র মাতার চরণে প্রণাম করিয়া গাড়ীতে উঠিবেন, এমন সময় ছোট খুকী দৌড়িয়া আসিয়া

SUPPLEMENT

TO

BAMABODHINI PATRIKA.

The following Review of Miss Toru Dutt's life and works, is from the Finel of M. James Darmestater (the celebrated Translator of the Zendavesta in the New series of Religions Works of the East edited by Max Muller). It was written for Le Parlement. The portrait by our artist does not do full justice to Miss Dutt, but a vivid photograph given in the new Edition of the Sheaf Gleaned in French Fields makes our regret in this point the less.—*Editor.*

MISS TORU DUTT.

(From Le Parlement. Paris 11 & 13 April 1883.)

The name of Miss Toru Dutt is already known to the readers of Le Parlement, by a touching notice which was consecrated to her by M. Andre Theureet* about

* M. Andre Theureet is the well-known author of 'Le Chemin des Bois' a volume

two years ago.† I would not have returned to a subject already touched by a hand so delicate, if new documents, published since, had not permitted to the far-off friends to the poor and young Hindu lady to represent to themselves, in a closer view, this sweet and melancholy face which by so many of its features belongs to France. This child of Bengal, so admirably, and so strangely gifted; poet in English, prose-writer in French; Hindu by race and tradition, English by education, French in heart; who at eighteen years made known to India the poets of France, in the rhythm of England; who mingled in her single personality, three souls, and three traditions; removed from the earth at twenty years in the full expansion of her talent, and in the very dawn of her genius—presents, in literary history, a phenomenon without a parallel, and her name ought especially remain dear to France—the France which she loved so much and towards which she was drawn by a mysterious instinct.

Toru Dutt was the daughter of a Hindu Magistrate of high caste, Govin Chunder Dutt of Calcutta. Mr. Dutt was converted to christianity, and, what is more in India, to the European spirit itself, although remaining substantially Hindu. This conciliation of two spirits, all apparent and upon the surface, in most cases, had already been made in the father before it was made in the child. Toru Dutt was the youngest of three children all of whom were predestined to an early death, she survived the last and only for a brief space of time. Mr. Dutt in a memoir of a simplicity of resignation almost sublime, published at the beginning of the poems of his daughter, has taken a sort of heart-rending relief in presenting the statistics of the griefs, which rendered his heart desolate, when he was on the verge of old age.

"Toru Dutt was the youngest of my three children. All the three were of great promise, and all the three were taken away from me early, in the very bloom of youth. I note the dates on which they were born and the dates on which it pleased the Lord to remove them hence.

Names.	Born.	Died.
Abja ...	18th Oct. 1851	9th July 1865.
Aru ...	13th Sept. 1854	23rd July 1874.
Toru ...	4th Mar. 1856	30th Aug. 1877.

In 1869 Mr. Dutt brought the two children who were still left to him, to Europe, to have them instructed in the languages of the West. They passed some months in France in a 'pensionnat,' or girl's school. They remained a much longer time in England, and returned to India in 1873. We should have loved to have more details about their short sojourn in France, which had an astonishing influence in the direction of the ideas of Toru. The language of France became her favourite language, the people of France her people of election. Some of the secondary characters in her French romance, for instance, Sister Veronica must have been met with in real life, although, the majority of the others had not been met with except in books, and the English school-friend who at the convent lends Musset to the heroine, is, certainly, a real souvener, of the school. Toru was fifteen at the time of the war; she was then in London; our disasters

of Poems of very rare merit. He has written also a Drama in verse, Jean-Marie which was acted at the Odeon in 1871 and of several novels such as "Narvelles Intime" "Mademoiselle Geugnon," "Une Ondine" &c-&c of considerable power. He contributes largely to the Revue des deux Modes, both in prose and verse.

† Le Parlement of the 24th January 1881.

struck the child to the heart. Her journal* bears on the date of the capitulation of Paris, the following lines. "During the few days that we were in Paris—how beautiful it seemed! What houses! What streets! What a magnificent army! But now how is it fallen! It was the first among the cities, but now how much of misery does it contain! from the very commencement of the war, all my heart was with the French, although I was sure of their defeat. One evening when the war continued and when the French had suffered many losses, I heard papa say something to mamma about the Emperor. I descended the stairs like a flash of lightning, and I learnt that the French had capitulated. The Emperor and all his army had given themselves up at Sedan. I well remember how I remounted the staircase and related this to Aru—half choking,—half weeping. Toru remained, however "enebranlable Francaise" (unshaken French woman) notwithstanding the defeat of her friends and notwithstanding her Christian education, which made her fear, she saw in the fall a punishment for France's want of religion† "Is it because many were profoundly plunged in sin and believed no more in God? But still there were, and there are, amongst them thousands who fear God. O France, France, how art thou fallen? Mayest thou after this humiliation serve and adore God more than thou hast done in the time past! * * * * Poor, poor France, how my heart bleeds for thee!" She had hoped a long time, and even to the very end. Here is a posthumous poem recently published, and which is, without doubt, one of her first poetic efforts. It bears date 1870, and brings us probably to the time of Coulmeers or of Chanipegny and of those unexpected flashes of hope which came momentarily to illuminate our horizon.

FRANCE.

1870.

Not dead,—oh no,—she cannot die!
Only a swoon, from loss of blood!
Levite England passes her by,
Help, Samaritan! None is nigh;
Who shall stanch me this sanguine flood?
Range the brown hair, it blends her eyne,
Dash cold water over her face!
Drowned in her blood, she makes no sign,
Give her a draught of generous wine.
None heed, none hear, to do this grace.

Head of the human column thus
Even in swoon wilt thou remain?
Thought, Freedom, Truth, quenched ominous,
Whence then shall Hope arise for us,
Plunged in the darkness all again!

No, she stirs! There's a fire in her glance,
Ware, oh ware of that broken sword!
What, dare ye for an hour's mischance,
Gather around her, jeering France,
Attila's own excellent horde?
Lo, she stands up,—stands up e'er now,
strong and more for the battle fray,
Gleams bright the star, that from her brow
Lightens the world. Bow, nations, bow,
Let her again lead on the way!

The two sisters plunged into our poetry with passion, especially our contemporary poetry; they translated from all our poets great and small; they had at that time some years of happiness; in a fever of

---

* Quoted in the Notice of Mlle Claresse Bader.

† Let us add that Indian opinion at the time of war was all in favor of Germany. "The opinion of the high castes" M. Barth tells us, "was worked upon by the Protestant Missions in which Germans abound in great number, and by the professors which the German Universities furnished to the Universities of India. Our Catholic Missionaries do not act save on the inferior classes."

study, of poetry, of dreams, and of projects, and were rocked the while in music. They were both beautiful players on the piano, and the poor father says had a 'soft and clear contralto voice which I fancy I still hear at times.' Their great ambition was to publish a French novel of which Toru would write the text and Aru would design the illustrations. Toru alone could fulfil her task: Aru, death already in her heart translated the Young Captive of Chemer

"I wish not to perish too soon,"

and passed away on her twentieth year in July 1874. Toru was left alone with her remembrances, her dreams, her devouring aspirations,—and then the resigned and calm anguish of death—which came to take her—her also. On her return to India she had turned to Sanskrit and after the study of Hugo and Lamartine had plunged into the Puranas and the Ramayana. She published in the Bengal Magazine two essays on Leconte de Lisle and Soulary and two legends in verse from the Vishnu Purana. In 1876 she published a collection of translations from the French poets (A Sheaf gleaned in French Fields) which passed without notice. In 1877 the Calcutta Review published some translations from the Count de Grammant and from Sainte-Bawe; the number following, gave the remainder of these poems and announced the death of the author; she had faded away in her turn, in the arms of her father on the 30th August in her one and twentieth year.

Life has passed so quickly with her, that Fame had not time to visit her when living. Fame came at last—after death,—in France at first, then in England. In the last years of her life she had opened a correspondence with Mlle Claresse Bader, and had expressed a desire to translate M. C. Bader's work on the women of India. It was M. C. Bader who received from Mr. Dutt the manuscript of the "Journal Mademorselle d'Arvers," and who published it in Paris in 1879 with a touching essay on the life and work of her friend. A second edition of Toru Dutt's Sheaf Gleaned in French Fields published in 1878 with a preface by her father was very soon exhausted, and last year there appeared a volume of Indian Ballads*—last *Reliquoe*, and which forms the poetic crest of this crown so soon broken.

I shall not say more than a few words about Mademorselle d'Arver, which has especially an interest of curiosity. As the work of a Hindu of eighteen who had tuition in French only for a few years, and who had lived in France only for six months, it is a literary "tour de force" without an example. The Vathek of Beckford can alone be compared to it, but only at a distance, for to an English gentleman at the end of the Eighteenth Century, French was almost a second mother-tongue. As regards the book itself it is a romance written by a young girl who has read Octave Feuillet, who knows life in the world from books, its tragedies from the column of "divers facts" on the third page of newspapers, but who has already the presentiment of a great number of things. The subject, if I am not mistaken is inspired by a domestic tragedy which occurred some years ago in Brittany,—a fratricide from jealousy. The heroine loved by a young officer named Louis Tefivre only loves him as a brother, and gives all her most tender affection to a Count Dunois de Plonarven to whom she is affianced, and by whom she believes her beloved; but the Count loves another and in an access of madness kills his brother Gaston who crosses his love and plans

* This volume has also been quite exhausted.—*Editor*.

দাদার হাত ধরিয়া বলিল "দাদা যাবে না।" হাতে একটী সুন্দর গোলাপ ছিল, দাদাকে দিয়া বলিল "দাদা ফু।" একদিকে ছোট ভগিনীর সুন্দর মুখ ও স্নেহমাখা কথা, অপরদিকে সেই শিশির-ধৌত সুকুমার গোলাপ পুষ্প। সতীশের মনের ভাবান্তর হইল, তিনি আদরে ভগিনীকে চুম্বন করিয়া অন্যমনস্কে সেই গোলাপটী হস্তে করিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। দেখিতে দেখিতে যান দৃষ্টি-বহির্ভূত হইল।

প্রায় দ্বাদশবর্ষ অতীত হইল। মাতা সতীশের জন্য যে সকল বিপদ আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহা বাস্তবিকই ঘটিয়াছিল। বিদেশে স্বাধীনতা পাইয়া তাহার দুর্দমনীয় ভাব সকল আরও বিকৃত হইতে লাগিল, জীবন ক্রমে পাপকলঙ্কে বিষম কলঙ্কিত হইয়া উঠিল। মধ্যে মধ্যে সেই বাল্যজীবন ও ধার্ম্মিকা জননীর কথা মনে পড়ে না তাহা নহে, কিন্তু সে পবিত্র স্মৃতি দীর্ঘ নিশ্বাসেই পর্য্যবসিত হয়। সে স্মৃতি এত পবিত্র, এত সুন্দর, যে ভাবিতেও যেন ভয় হয়। মাতার নিকট স্বদেশ বিদেশ কিছু পার্থক্য আনিয়া দিতে পারে না। সে স্বর্গীয় স্নেহের নিকট কালের প্রভাবও স্থান পায় না। ক্ষুদ্র শিশু পৃথিবীর নিকট বিদায় লয়, জগতের আর কেহ কি তাহাকে স্মরণ করে? কিন্তু কোন্ জননী সেই অপরিস্ফুট কুসুমটীর জন্য দীর্ঘ নিশ্বাস না ফেলেন? যত কেন সন্তান জন্মুক না, তাহার স্থানটী শূন্য থাকিবে, অলক্ষিতে মাতার প্রাণকে সেই অমর রাজ্যের দিকে আকৃষ্ট করিবে। নিতান্ত ক্ষুদ্র শিশুর জন্য যদি মাতার স্নেহ এত প্রবল, তবে যে তাঁহার স্তনদুগ্ধপানে বর্দ্ধিত, যে তাঁহার অপরিমেয় স্নেহযত্নে পালিত সে সন্তানের জন্য মাতার প্রাণে কি হয়, তাহা লেখনীর সাধ্য নাই প্রকাশ করে।

কালে সতীশের অনেক বন্ধু জুটিল, ক্রমে অনেক অর্থ হস্তগত হইল, কিন্তু ক্রমেই সে দেখিতে পাইল যে মনের শান্তি অভাবে সে কৃত্রিম আমোদে সুখ অন্বেষণে অধিক ব্যগ্র। এভাবে আর কতদিন যাইবে? এক একটু করিয়া তাহার সঙ্গীদিগের প্রতি অনুরাগের হ্রাস হইতে লাগিল, অন্তঃসারশূন্য আমোদ তাহার বিষবৎ অসহ্য হইয়া উঠিল। কিন্তু অভ্যাসের এমনি শক্তি যে তাহা কোন মতে ছাড়িতে পারিল না। যখন তাহার মনের এইরূপ আন্দোলনের অবস্থা, হঠাৎ এক খানি পত্র তাহার হস্তগত হইল। যে সতীশ বাটীর পত্র আসিলে বড় গ্রাহ্য করে না, আজ কেমন মন হইল সব ছাড়িয়া সেই পত্র খানি অগ্রে খুলিল। "দাদা আমরা মাতৃহীন হইলাম। 'হে ঈশ্বর সতীশকে পাপের হস্ত হইতে উদ্ধার কর' এই মার শেষ কথা।"

পত্রে কেবল মাত্র ঐ কয়টী কথা। অনেক দিন যে চক্ষে জল আসে নাই, অনেক দিন যে হৃদয় পবিত্র কিছু

ভাবিতে সমর্থ হয় নাই, আজ সেই শুষ্ক চক্ষের জলধারায় বক্ষ ভাসিয়া গেল, সেই কঠোর হৃদয় মাতৃশোকের নিকট পরাজয় স্বীকার করিল। মাতার ছবি সন্তানের চক্ষের সমক্ষে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। সতীশের কষ্ট দেখে কে? সেই পবিত্র মূর্ত্তি শয়নে স্বপনে সজনে নির্জ্জনে যেন সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতে লাগিল। যত মাতার কথা মনে পড়িতে লাগিল, ততই পুত্রের অনুতাপাগ্নি বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

এক দিন শয়ন করিয়া আছে, হঠাৎ স্বপ্নে দেখিল সেই পবিত্র স্নেহময়ী মূর্ত্তি যেন স্বর্গ হইতে অবতরণ করিয়া বলিলেন "সতীশ! অনেক দিন তোমাকে দেখি নাই, কিন্তু বৎস তুমিই আমার প্রার্থনার প্রধান সামগ্রী। অনেক প্রার্থনার সন্তান কখনও বিনষ্ট হয় না। পরম পিতা পরমেশ্বর আমার বাসনা পূর্ণ করিবেন। মাতা স্বর্গে গেলেও সন্তানের সঙ্গে যে মধুময় যোগ, তাহা কখনও বিচ্ছিন্ন হয় না"। দেখিতে দেখিতে সেই জ্যোতির্ম্ময়ী ছায়া মিলাইয়া গেল। সতীশের আর সে রাত্রি নিদ্রা হইল না। যেদিন মাতার নিকট বিদায় গ্রহণ করেন, সে রাত্রিতে শয্যাপার্শ্বে আসীন জননী মূর্ত্তি এবং এই রাত্রির দৃশ্য দুইটী যুগপৎ তাঁহার প্রাণকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। তিনি পরদিবস স্বদেশ যাত্রা করিলেন। মনের যন্ত্রণা দূর করিবার জন্য একবার এ পুস্তক একবার ও পুস্তক খুলিতেছেন। একি! বহুকাল পূর্ব্বে নির্দ্দোষ শিশু যে পবিত্র কুসুমটী দিয়াছিল, আজ অকস্মাৎ পুস্তক মধ্যে সেইটীতে দৃষ্টি পড়িল। কুসুমটী আজ বিশুষ্ক। স্মৃতি বড় মধু-ময় হইয়া যেমন প্রাণকে অতীত রাজ্যে লইয়া যায়, সেইরূপ ইহা আবার হৃদয়কে দাহন করে। এই শুষ্ক ফুলটী মনে অনেক দিনের কথা জাগাইয়া দিল, সতীশের হৃদয় আরও ব্যথিত হইল।

পুত্র আর কোন্ প্রাণে মাতার মূর্ত্তি বিস্মৃত হইবে? গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের পর আর সতীশ সে পূর্ব্বের সতীশ নাই। 'অনুপযুক্ত সন্তান হইয়া ধার্ম্মিকা মাতার মনে কষ্ট দিয়াছি, কিসে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে' সেই ভাবিয়া পুত্র এখন একান্ত অধীর।

একে একে মাতার সদ্গুণ—মাতার প্রার্থনা সন্তানের প্রাণকে সেইদিকে আকৃষ্ট করিতে লাগিল। যে দেবদেবের প্রতি ভক্তি বিশ্বাস জননীকে সকল বিঘ্ন বাধার মধ্যে অটল রাখিয়াছিল, তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া দুরাচারী সন্তান এখন মুক্তির উপায় অন্বেষণে জীবন সমর্পণ করিল। এত দিনের অবিশ্রান্ত যত্ন ও প্রার্থনার সুফল এখন ফলিল। পুণ্যবতীর পুণ্যপ্রভাবে সন্তানের পাপ অন্ধকার বিদূরিত হইল।

পাঠিকা ভগিনি! আপনাদের মধ্যে অনেকেরই প্রতি মাতার গুরুভার অর্পিত। মাতা সন্তানকে স্নেহ করেন,

ইহা সকলেই জানে। সন্তানের শুভ কামনা মাতার প্রাণের বাসনা, ইহাও কাহারও অবিদিত নাই। কিন্তু সেই স্নেহই যথার্থ স্নেহ, যাহা সন্তানের আত্মার মঙ্গল কামনায় নিরত। সেই অবিনাশী স্বর্গীয় কুসুমের সৌন্দর্য্য সাধনে যে জননী ব্যস্ত হন এবং দৃঢ় বিশ্বাস ও ভক্তিতে পরমেশ্বরের সহায়তা দ্বারা সেই মহদুদ্দেশ্য সাধনে কৃতসংকল্প হন, তিনি শীঘ্র হউক বিলম্বে হউক সফলতা লাভ করিবেনই করিবেন ইহা নিশ্চয়। মাতা সন্তানের যে সুমিষ্ট সম্বন্ধ, তাহা কিছুতেই বিচ্ছিন্ন হইবার নহে। পরলোকগতা জননীর পবিত্র প্রভা অলক্ষিতে সন্তানের জীবনে পুণ্যের জ্যোতি বিস্তার করে, স্বর্গীয় সন্তানেরও নির্ম্মল শোভা গোপনে মাতাকে সেই অমর রাজ্যের দিকে আকৃষ্ট করিয়া থাকে।

হৈমকীর্ত্তি।

আজ একটি হৈমকীর্ত্তি বর্ণনা করিব। কীর্ত্তি ত অনেক প্রকার আছে, কিন্তু হৈমকীর্ত্তি কাহাকে বলে?—কষ্টসহিষ্ণুতার নামই কি হৈমকীর্ত্তি? কিম্বা বিজয়িজনোচিত যশোলালসায় উন্মত্ত হইয়া দেশ, গ্রাম, নগর, জনপদ নররক্তে প্লাবিত করিয়া যশের তরি ভাসাইলাম, তাহাই কি হৈমকীর্ত্তি বলিয়া অভিহিত হইবার উপযুক্ত? অথবা সৈন্যগণ সেনাপতির অলঙ্ঘনীয় আজ্ঞানুসারে সম্মুখ সমরে প্রবেশ করিয়া একে একে নিধন প্রাপ্ত হইল, তাহাই কি হৈমকীর্ত্তি হইল?—না; —তবে তাহা কি?—আত্মোৎসর্গ—যে আত্মোৎসর্গে বাধ্যবাধকতা কিছুমাত্র নাই—যে আত্মোৎসর্গে আভাস মাত্রও স্বার্থপরতার সংস্পর্শ নাই। আসন্ন বিপদে মৃত্যু যেন মুখের দিকে ভ্রূকুটি করিতেছে, তথাপি মানুষ স্বেচ্ছাক্রমে বিপদের সম্মুখীন হইয়া, পরের উদ্ধারের জন্য নিঃস্বার্থভাবে হাতে ধরিয়া স্বীয় জীবনকে বিসর্জ্জন করিতেছেন, এরূপ দৃষ্টান্তই যথার্থ হৈমকীর্ত্তি। আজ একটি রমণীর হৈমকীর্ত্তি বর্ণনা করিব—দেখাইব কোমলা ক্ষীণাঙ্গী ললনাও কিরূপে অন্যের জন্য স্বীয় জীবন অকুণ্ঠিতভাবে উৎসর্গ করিয়া নারী, জন্মের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন!

গভীর অন্ধকার না ঘেরিলে দীপ শোভা পায় না, তামসী নিশা উপনীত না হইলে শারদ চন্দ্রমার স্ফটিক জ্যোৎস্না হাসে না, বর্ষণ না হইলে প্রস্তরখণ্ড হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয় না, আকাশ ঘনঘটায় আচ্ছন্ন না হইলে চপলার জ্যোতি খেলে না; জীবনাকাশ বিপদ রাশিতে আবৃত না হইলে মানব হৃদয়ের লুক্কায়িত সৌন্দর্য্যের বিকাশ হয় না;

তাই আসুন একবার অষ্ট দশ শতাব্দীর ফরাসী রাষ্ট্র বিপ্লবের আতঙ্কজনক দৃশ্যের মধ্যে কোন "শোভন চিত্র" আছে কি না, একবার অন্বেষণ করিয়া দেখি।

—আজ সেই দিন, যে দিনের কথা স্মরণ করিতে শতাব্দী পরেও পারিসের সম্ভ্রান্ত লোকদিগের প্রাণ আতঙ্কে অধীর হইয়া উঠে—যে দিনে রক্তপিপাসু য্যাকোবিনেরা (Jaoobins)ও রবিস্পিয়ারের অনুচরবর্গ পারিসের কারাগার সমূহ রক্তে রঞ্জিত করিয়া আপনাদের নয়নের সাধ মিটাইল, —আজ সেই ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের ২ রা সেপ্টেম্বর। ঐ দেখুন লা ফোর্স কারাগারে একটি বিধবা রমণী জীবনের বিষম ও শেষ পরীক্ষাস্থলে দণ্ডায়মান—আজ তিনি প্রিয়সখীর জন্য স্বীয় জীবন অবাধে উৎসর্গ করিলেন। ইনি কে?—ল্যামবেল রাজকুমারী লুইসা। ইনি ১৭৪৯খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন; অল্প বয়সেই বিধবা হন; ১৭৭৪খ্রীষ্টাব্দে রাজ্ঞী এণ্টইনের বাটীর তত্বাবধান কার্য্যে নিযুক্ত হন, ক্রমে রাজ্ঞীর সহিত বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হন। ফরাসী রাষ্ট্র বিপ্লবের প্রথম উদ্গিরণেই তিনি তাঁহার শ্বশ্রূ সমভিব্যাহারে ইংলণ্ডে গমন করেন, কিন্তু প্রিয়সখীর বিপদের কথা স্মরণ করিয়া আর থাকিতে পারিলেন না, পারিসে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া রাজপরিবারের সহিত মিলিত হইলেন এবং তাঁহাদের সহিত টেম্পল কারাগারে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তিনি ১০ ই আগষ্ট নিষ্ঠুর ভাবে স্বীয় বন্ধুর পার্শ্ব হইতে ছিন্ন হইয়া লা ফোর্স কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। কারাগারের কষ্টকে তিনি কষ্ট মনে করিলেন না; কিন্তু বন্ধু বিচ্ছেদের যন্ত্রণা তাঁহার প্রাণে বাজিল। —আজ ২ রা সেপ্টেম্বর —সন্ধ্যার প্রাক্কাল—লুইসা জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান—তাঁহার শেষ পরীক্ষার সময় উপস্থিত। তিনি ঘাতকদিগের নিকট নীত হইলেন, তাঁহাকে বলা হইল "স্বাধীনতা, সাম্য এবং রাজা ও রাজ্ঞীর প্রতি বিজাতীয় ঘৃণা স্বীকার কর।" লুইসার প্রশান্ত ও গম্ভীর মুখ গম্ভীরতর ভাব ধারণ করিল, —একদিকে তাঁহার নিজের জীবন, অপর দিকে রাজা ও রাজ্ঞীর কল্যাণ। তিনি ভাবিলেন হতভাগ্য ষোড়শ লুই ও প্রিয়তম এণ্টইনে—যাঁহাকে তিনি প্রাণের সহিত ভাল বাসেন, যাহার জন্য তিনি কারাগার যন্ত্রণা ভোগ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই. আজ কোন্ প্রাণে তাঁহাদের অমঙ্গল কামনা করিবেন? না—তাহা সম্ভব নহে—তিনি দৃঢ়তার সহিত উত্তর করিলেন "অকুণ্ঠিত ভাবে প্রথম ছুইটি স্বীকার করিব, কিন্তু শেষটি পারি না, ইহা আমার হৃদয় অস্বীকার করে।" অমনি ঘাতকগণ গর্জ্জিয়া উঠিল "যদি জীবন চাও, তবে স্বীকার কর।" তাঁহার মন কি জীবন ভয়ে ভীত হইয়া টলিল? না—লুইসা স্বর্গের দিকে দৃষ্টি করিলেন এবং দুই হাত উর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া এক পদ অগ্রসর হইলেন,

অমনি মুহূর্ত্তেকে ঘাতকদিগের শাণিত অস্ত্রে তাঁহার বক্ষ বিদীর্ণ হইল—মুহূর্ত্ত পরে আর কিছু নাই—প্রাণপাখী দেহ-পিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া গেল, তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছিন্ন হইল, হৃৎপিণ্ড বিদারিত হইল—দেহবিচ্যুত মস্তকের কেশকুন্তল লুটাইয়া পড়িল—লুইসা মরিলেন, কিন্তু মরিয়া ভালবাসার পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন—তাঁহার হৃদয়ের যে সৌন্দর্য্য এতদিন লুক্কায়িত ছিল, আজ তাহার পূর্ণ বিকাশ হইল।

আশাবতীর উপাখ্যান।

(২৩৩ সংখ্যা ৫৬ পৃষ্ঠার পর)

যোগী। আশাবতী! ঐ দেখ ব্রহ্ম-যোনিতে উঠিবার সিঁড়ি।

আশাবতী। উ উ উঃ !!! অত সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উঠা তো সহজ নহে। সিঁড়ির পথে আসিলে বোধ হয় উঠিতে নামিতে পারিতাম না।

যোগী। ঐ যে ডোবাটী দেখিতেছ, উহারই নাম গোড়ধোওয়া অথবা পাদোদক তীর্থ। কথিত আছে দ্বাপর-যুগে শ্রীকৃষ্ণ এখানে আসিয়া পা ধুইয়া-ছিলেন। এই স্থানে শ্রীচৈতন্য মহা-প্রভুর প্রথম ভাবাবেশের সঞ্চার হয়। শ্রীচৈতন্য পিতৃশ্রাদ্ধ করিবার জন্য প্রথমে এই স্থানে উপস্থিত হন, এস্থানের শোভা দেখিয়া তাঁহার চিত্ত আহ্লাদে প্রফুল্ল হয়। যখন শুনিলেন এখানে শ্রীকৃষ্ণ চরণ ধৌত করিয়া ছিলেন, তখন ঐ কুণ্ডে প্রণাম করিয়া তাহার জল মস্তকে দিলেন, একটু পান করিলেন। পরে স্নান করিয়া তর্পণাদি করিলেন। তৎপরে বিষ্ণুপদে পিণ্ড দিয়া যখন বাহির হন, তখন পরমভক্ত ঈশ্বর-পুরীকে দর্শন করিয়া তাঁহার প্রেমে মুগ্ধ-হইয়া তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইলেন। যে মুহূর্ত্তে দীক্ষিত হইলেন, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই তাঁহার হৃদয়ে মহাভাবের সঞ্চার হইল। শ্রীচৈতন্যের ন্যায় অনেক মহাত্মা এই গয়াধামে ধর্ম্ম জীবন লাভ করিয়াছেন। ইহা সিদ্ধ স্থান। ইহার সেই সিদ্ধ পুরুষগণের শ্বাস প্রশ্বাস এখনও গয়ার বিশুদ্ধ পার্ব্বতীয় সমীরণে প্রবাহিত হইতেছে।

আশাবতী। সেকি প্রভো! শ্বাস প্রশ্বাস কি এক স্থানে বসিয়া থাকে? ইহার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলাম না।

যোগী। মৃগনাভি কোন গৃহে বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখিয়া কিছু দিন পরে তাহা স্থানান্তরিত করিলেও বিশ পঁচিশ বৎসর পর্য্যন্ত যখনই বাক্স খুলিবে তখনই গন্ধ পাইবে। ইহা কিরূপে সম্ভব হয়?

বিশ্বপতি জগদীশ্বরের কি যে মহিমা—কি যে কৌশল তা কে বলিতে পারে? দেখ এক জমিতে খুব কাছাকাছী করিয়া সিম, তেঁতুল, আক, লঙ্কা, আম, কাঁঠাল, প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বৃক্ষ রোপণ কর। একস্থানে এক রসে বর্দ্ধিত হইয়া সিম তিক্ত, তেঁতুল টক, আক মিষ্ট, লঙ্কা ঝাল, আম ও কাঁঠাল স্ব স্ব আস্বাদযুক্ত। ইহা কিরূপে হয় তা কি কেউ বলিতে পারে? মা আশাবতী! ভগবানের অনন্ত মহিমা, মনুষ্য ক্ষুদ্র কীট। ক্ষুদ্র পুঁটি মাছ কি মহাসমুদ্র সন্তরণ দিয়া সীমা করিতে পারে? না। কখনই না। মহাসমুদ্র অপেক্ষাও জগদীশ্বর অনন্ত। কে তাঁহার মহিমা জানিতে পারে? তিনি কৃপা করিয়া যতটুকু জানান, ততটুকু জানিতে পারে। ইহা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি যেখানে কোন মহাত্মা তপস্যা করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, সহস্র বৎসর পরেও যদি কেহ সেইরূপ তপস্যার ভাবে শুদ্ধ মনে সেই স্থানে উপবেশন করেন, সেই মুহূর্ত্তেই সিদ্ধ পুরুষের কুণ্ডলিনী শক্তি তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া অভিভূত করিবে সন্দেহ নাই।

আশাবতী। কুণ্ডলিনী শক্তি কাহাকে বলে?

যোগী। যোগে প্রবৃত্ত হইলে জানিতে পারিবে। তথাপি এই মাত্র বলি ধর্ম্মসাধনের আরম্ভেই গুরুর কৃপা-দৃষ্টিতে আত্মা মোহনিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া স্বীয় গৃহ দেহকে শুদ্ধ করিবার জন্য গুরুদত্ত মহাশক্তি শরীরে প্রয়োগ করেন, তাহাতে শরীরে এক অপূর্ব্ব তাড়িত শক্তি প্রবাহিত হইতে থাকে। মেরুদণ্ড তাহার পথ, মস্তিষ্ক গম্যস্থান, ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না এই স্নায়ুত্রয় এই তাড়িত শক্তি চালনের রজ্জু। এই তাড়িত শক্তি যতই শরীরে চালিত হয়, ততই শরীর শুদ্ধ হয়। এজন্য এই ক্রিয়াকে ভূতশুদ্ধি কহে। যোগসাধন করিতে হইলে আসন শুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি, প্রাণায়াম এই তিনটী বিশেষ প্রয়োজন। এখন অসময়ে ইহার আলোচনা ভাল নহে। চল আমরা ভ্রমণ করি। ঐ যে ঘেরা বাড়ীর মধ্যে ঐ বট বৃক্ষটী দেখিতেছ, উহাকে অক্ষয় বট কহে। পিতৃলোক অক্ষয় তৃপ্তিলাভ করিবে এই আশায় লোকে এখানে শ্রাদ্ধ করিয়া থাকে।

আশাবতী। ওটা কিসের মন্দির?

যোগী। মা আশাবতী। ঐ দিব্য সুন্দর মন্দিরটীই বিষ্ণুমন্দির। ঐ মন্দিরের মধ্যে বিষ্ণুর পদচিহ্ন আছে।

আশাবতী। অতিসুন্দর মন্দির। বোধ হয় যেন একখানি পাতর কাটিয়া মন্দিরটী গড়িয়াছে। এ মন্দির কি বরাবরই রহিয়াছে?

যোগী। না মা! পূর্ব্বে এখানে ঘরবাড়ী এমন কিছুই ছিল না, এ মন্দিরটী অহল্যাবাই নির্ম্মাণ করিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। অহল্যাবাই হোলকার

রাজ্যের রাজরাণী ছিলেন। তাঁহার অনেক সৎ কীর্ত্তি আছে। কাশী হইতে জগন্নাথ ক্ষেত্র পর্য্যন্ত রাস্তা বান্ধাইয়া দিয়াছেন, রাস্তার প্রত্যেক তিন ক্রোশ পরেই যাত্রীদের থাকিবার জন্য চটী ও জলাশয় স্থাপন করিয়াছিলেন। কাশীতে অতিসুন্দর সুপ্রশস্ত ঘাট বান্ধাইয়া দিয়াছেন। ঐ যে ঠাকুর ঘর দেখিতেছ, উহার মধ্যে অহল্যাবাইয়ের প্রস্তর-নির্ম্মিত মূর্ত্তি আছে। পাণ্ডারা তাহার ভোগ দিয়া থাকেন।

আশাবতী। আহা! এমন পুণ্যবতী নারীকে পূজা করিলেও জীবন সার্থক হয়। চলুন, আমাকে বিষ্ণুপদ দর্শন করান।

যোগী। অত্যন্ত ভিড়, আমার হাত ধরিয়া এস। আজি অপরাহ্ণেও এত ভিড়। এই দেখ ঐ যে রূপা দিয়া কুণ্ড বান্ধান, উহার মধ্যে বিষ্ণু পদ আছে। ফুল তুলসী পিণ্ডে ঢাকিয়া গিয়াছে।

আশাবতী। (মনে মনে) আমার কত পূর্ব্ব পুরুষ আসিয়া পিতৃ পুরুষগণের শ্রাদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আমি আজ সেই স্থানে উপস্থিত। ওগো! স্বর্গবাসী পিতামাতাগণ! আপনারা দেখুন আপনাদের দুঃখিনী কন্যা আজি এখানে শূন্য হস্তে। আপনাদের নামে আমার এই চক্ষের জল বিষ্ণুপদে ফেলিতেছি, ইহাতেই আপনারা তৃপ্তিলাভ করুন। হে বিষ্ণু! আমার পিতৃলোকের জন্য এই চক্ষের জল গ্রহণ করুন। আমি যাতে শীঘ্র যোগিনী জননীর দেখা পাই, আমাকে এমন দয়া করুন। প্রণাম। বিষ্ণুপদে হস্ত প্রসারণ ও স্পর্শ করণ। প্রণাম।

যোগী। এই স্থানকে মাতৃষোড়শী কহে। মাতা সন্তানকে গর্ভে ধারণ করা হইতে তাহার পালন পর্য্যন্ত যত কষ্ট সহ্য করেন, সেই সমস্ত উল্লেখ করিয়া এখানে মাতৃদেবীর শ্রাদ্ধ করিতে হয়।

আশাবতী। (চক্ষু মুদিয়া মনে মনে) মা গো! দুঃখিনী কন্যার পানে এক বার চাও মা। তুমি এখন স্বর্গে আছ। সেখান থেকে আমাকে ডাক, আমাকে আশীর্ব্বাদ কর। মা! আমার দ্বারা যেন তোমার পবিত্র নাম কলঙ্কিত না হয়। মা! আমাকে আশীর্ব্বাদ কর। আমি তোমার কন্যা, এ আমার পরম গৌরব।

যোগী। আশাবতী! বিষ্ণুপদের বিবরণ কিছু কি জান?

আশাবতী! আজ্ঞা, আমি অবলা সরলা নারী, এ সকল বিষয় কিরূপে জানিব।

যোগী। সংক্ষেপে বলি শুন। বায়ু-পুরাণে লেখা আছে যে, গয়াসুর নামে এক অসুর ব্রহ্মার তপস্যা করিয়া এই বর লইলেন যে, তিনি পবিত্র, তাঁহার শরীর পবিত্র, তিনি যাহা দেখিবেন তাহাও পবিত্র হইবে। তিনি সমস্ত নরনারীর প্রতি দয়া করিয়া নানা দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করিয়া সকলকে পবিত্র করিলেন।

যখন পৃথিবী সম্পূর্ণ পবিত্র ও পাপশূন্য হইল, তখন যমালয়ে গিয়া সমস্ত নরক-বাসীদিগকে পবিত্র করিলেন। যম দেখিলেন তাঁহার অধিকার নষ্ট হইল। তখন তিনি সমস্ত দেবতার সঙ্গে ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন। ব্রহ্মা সকলকে লইয়া বিষ্ণুর নিকট গেলেন। বিষ্ণু দেবতাদিগকে বলিলেন যে চল আমরা সকলে অসুরের নিকট যাই। ব্রহ্মা বিষ্ণু ও অন্যান্য দেবতাগণ গয়াসুরের নিকট উপস্থিত হইলে ব্রহ্মা বিষ্ণুর উপদেশানুসারে বলিলেন, "হে গয়াসুর! তুমি অতি দয়ালু, আমাদিগকে একটী পদার্থ দান করিতে হইবে।" গয়াসুর বলিলেন "আজ্ঞা, যাহা আমার সাধ্য আমি তাহা অকাতরে দান করিব।" দেবতারা বলিলেন, "আমরা একটী যজ্ঞ করিব তাহার জন্য পবিত্র স্থানের প্রয়োজন, কিন্তু পৃথিবীর একটু স্থানও পবিত্র নাই। পৃথিবীতে এক অঙ্গুলী পরিমাণ স্থানও নাই যাহা মনুষ্যেধ মৃতদেহের দূষিত পরমাণুতে কলুষিত হয় নাই। এই ত্রিভুবনে যজ্ঞ সাধনের একটুও স্থান পাইলাম না। তোমার শরীর অতি পবিত্র, আমাদের যজ্ঞ কাল পর্য্যন্ত তুমি যদি শয়ন করিয়া থাক, তাহা হইলে তোমার পবিত্র শরীরের উপর আমরা যজ্ঞ সাধন করিতে পারি।" গয়াসুর দেবতাদিগের এই প্রার্থনা শুনিয়া আনন্দে প্রফুল্ল হইয়া বলিলেন "আমার নশ্বর দেহ ধন্য হইল।" ইহা বলিয়া তিনি শয়ন করিলেন। বিষ্ণু গয়াসুরের মস্তকে পদস্থাপন পূর্ব্বক বলিলেন, "যতকাল আমার এই পদটী পূজিত হইবে, ততদিন তুমি শয়ন করিয়া থাকিবে। যে দিন পূজা হইবে না, সে দিন তুমি উঠিয়া চলিয়া যাইবে।" সেই অবধি আজি পর্য্যন্ত বিষ্ণুপদ পূজিত হইতেছে। যে দিন একটীও যাত্রী আসে না, সেদিন পাণ্ডারা নিজেই বিষ্ণুপদ পূজা করে।

ঐ যে ফল্গুর ওপারে ক্ষুদ্র পাহাড়টী দেখিতেছ উহার নাম রামগয়া। ঐ রামগয়া, রামশিলা, প্রেতগয়া, উত্তর শাসন, দক্ষিণ শাসন, পিতা মহেশ্বর, সতীস্থান, বুধগয়া প্রভৃতি আরও অনেকগুলি স্থান দেখিতে হইবে। অদ্য বেলা গেল, এখন চল আকাশ গঙ্গার আশ্রমে গমন করি। একদিন তাড়াতাড়ি করিয়া দেখাও ভাল নহে। আজ তোমার বড় পরিশ্রম হইয়াছে, চল মা! এখন আশ্রমে গমন করি। দয়াময় প্রভু তোমার এই সকল পরিশ্রম দেখিয়া তোমাকে তাঁহার যোগিনী কন্যার সহিত মিলাইয়া দিন।

লীলাময়ী ।

দ্বিতীয় স্তবক ।

শোভে পিনিয়াস তীরে প্রীতিশীলপুরী,
অভ্রভেদী সৌধ চূড়া হেমকিরীটিনী ;
সম্মুখে প্রমোদবন অপূর্ব্ব মাধুরী,
বিধৃত চরণতলে পূত কল্লোলিনী । ১

কাঁদে সতী বনে বনে কভু বসি তীরে,
গণিছে নদীর ঢেউ ; কভু কেলী রত
দেখিছে মরালমালা তটিনীর শিরে,
বেণী-শোভা মৃণালের ছিঁড়িছে নিয়ত । ২

একটী কুসুম কভু তুলিয়া যতনে,
ভাসাইলা দূতীবেশে প্রবাহিণী-জলে ;
"বলি ও নাথের ধরি দুখানি চরণে,
আসিলেন কেন তিনি এ দাসীরে ছ'লে" ৩

বলিও নাথেরে তুমি মঞ্জু কুঞ্জ শোভা,
ফুটন্ত বাসন্তি ফুলে সুন্দর সুবাস,
মন্দাকিনী কূলে সুরজন মনোলোভা,
ক্ষুদ্রা তটিনীর এই তরঙ্গ উচ্ছ্বাস । ৪

শেষ কথা বলো নাথে "সরস কুসুমে
রচিয়া স্তবক দাসী রেখেছে হিয়ায়,
দিতে প্রেম উপহার সেই অরিন্দমে ;
দেখিও সে ফুল যেন শুকায়ে না যায় ।" ৫

কভু বা প্রবেশি পুরে নির্ম্মল মুকুরে,
হেরে আপনার রূপ কি ভাবি কে জানে ?
কভু উঠি প্রাসাদের অভ্রভেদী চূড়ে,
চেয়ে থাকে ইলিয়ার বীর-ভূমি পানে । ৬

যায় দিন এই ভাবে ; আইল যামিনী—
উতরিল কালরাত্রি হৃদয়-আকাশে ;
ক্ষণে কাঁদে ক্ষণে হাসে, যেন পাগলিনী ;
উষা-প্রিয়া কমলিনী আঁখিনীরে ভাসে । ৭

একটী প্রদীপ শিখা করিয়া সঙ্গিনী,
তটিনীর তীর-বনে একাকী বেড়ায়,
শোনে নাবিকের গান ; মধুর রাগিণী
অস্বচ্ছ পঞ্চমে উঠি তরঙ্গে মিশায় । ৮

একে একে তীরাগত তরণী সকলে,
জিজ্ঞাসে আরোহিগণে নাথের বারতা ;
বিদেশী বণিক তারা নিরাপদ স্থলে
যাপিছে যামিনী ; কেউ কহিল না কথা । ৯

কহিলা কাণ্ডারী এক, এসেছে ত্যজিয়া—
পোড়া উদরের দায়ে—নবীনা যুবতী,
কাঁদিল তাহার মন বিবশা দেখিয়া
জাগিছে হৃদয়ে যাঁর প্রেমের মূরতি । ১০

কাঁদে যথা দূর বনে পিঁজিরার পাখী
প্রাণপ্রণয়িনী হারা, "কেনলো সুন্দরী
ভ্রমিতেছ বনে বনে ? অশ্রুভরা আঁখি
মুছাও যতনে ধনী, শোক পরিহরি । ১১

আসিবে অচিরে নাথ ; কি সাধ্য ছিঁড়িতে
সে হেন বন্ধন, যাহা বিধাতা আপনি,
বাঁধিলা যতন ভরে ; এহেন নিশিতে,
নির্জ্জনে ভ্রমে কি কভু সতী একাকিনী ?" ১২

ভাঙ্গিল চমক; মনে বাধানিয়া তায়
চলিলা ফিরিয়া সতী, পথে ফুলগণ,
নত শিরে বিধাতার আশীষ জানায়;
বিরহিণী সূর্য্যমুখী দিলা আলিঙ্গন।১৩

সহসা স্বর্গীয় জ্যোতি ধাঁধিল নয়ন,
যেন চন্দ্রলোক হ'তে চন্দ্রকান্তিময়
দুইটী অপূর্ব্ব জ্যোতি হইল পতন;
উজ্জ্বল কানন, স্থির দীপ্তির আলয়।১৪

দুইটী স্বর্গীয় ছবি যেনরে দম্পতী,
বিষাদে মলিন কিন্তু পবিত্র উজ্জ্বল;
বনদেব দেবীরূপে; সে হেন মুরতি
বিধাতার তুলিকার অতীত কৌশল।১৫

কহে দেব, "বীর-ভূমি বীরশূন্য আজ!
বীরশূন্য থেসেলিয়া; কালান্তক কাল,
লীলাময়ি! তব ভালে হেনেছে কি বাজ;
জান না স্বপনে সতী ভেঙ্গেছে কপাল!১৬

"হায়রে সুন্দর পুরী কুসুমিত বন,
সব স্বপনের খেলা আজি অন্ধকার;
ধন্য বীর, লভিয়াছ অমর জীবন;
রচিলা অনন্ত কীর্ত্তি অক্ষয় ভাণ্ডার।"১৭

"কি শুনালে দেব?" কহে দেবী মৃদুভাষে
"শুনি নিদারুণ কথা হৃদয় বিদরে,
বিরহিণী পাগলিনী ফিরে যার আশে
বনে বনে, আর তায় পাবে না কি ফিরে?১৮

"মাতৃহীনা লীলাময়ী জনম দুঃখিনী,
বড় যতনের মম স্নেহের পুতলী;
কহ দেব বীরের সে বীরত্ব কাহিনী;
ভূকম্পনে ছিন্নমূলা হায় বনস্থলী"।১৯

কহে দেব "বীর মম যতনের ধন;
সন্তান সমান আমি ভাল বাসি তারে;
লীলাময়ী দিব্য চক্ষে পাবে দরশন,
অমর স্বর্গীয় জ্যোতি শূন্যে নিরাকারে।২০

নিদারুণ দৈববাণী ট্রোজান সমরে
'প্রথমে গ্রীসের যেই হবে আগুয়ান;
নিশ্চয় মরণ তার হেক্‌টরের করে;'
তাই মৃত বীরচূড়া, নিয়তিসন্ধান।" ২১

দূরাগত বজ্রনাদে বিচেত যেমন
সুপ্ত শিশু; শুনি সতী নিদারুণ নাদ,
"হা বীর, হা পতি" বলি পড়ে অচেতন;
বিধাতা সতীর ভাগ্যে সাধিলা কি বাদ?২২

অমনি যতনে দেবী কোলেতে করিলা
স্নেহের তনয়া সতী চুমিলা বদনে;
করিলা কুসুম বৃষ্টি; চেতনা আইলা;
লুকাইলা স্বর্গজ্যোতি মিশি শূন্যমনে।২৩

শান্তির পরশে চির শান্তি মনে,
ভুলিয়াছে ধনী পতির নিধন;
প্রলয়ের পরে সাগর জীবনে,
একটীও বীচি ছুটে না যেমন। ২৪

নাই সে বিষাদ বদন কালিমা,
নাই সে নয়নে অজস্র ঝরণা;
একি মহামায়া?—কে বুঝে মহিমা,
পরশ পরশে শৈবলিনী সোণা।২৫

নিশীথ গগনে গভীরা যামিনী,
ক্রমে ক্ষীণপ্রভা আকাশের তারা;
বহে না কোথাও কল নিনাদিনী,
ক্ষিপ্রা শিনিয়াসে একটীও ধারা ২৬

সুধু দূরবনে অস্ফুট চিৎকারে,
দেখিছে পেচক জাগ্রত স্বপন;
আর লীলাময়ী? কল্পনা সাগরে,
ভাসাইয়ে তরী যাইছে কেমন? ২৭

"ব'স বীর-পতি কুসুম আসনে,
বড় সাধ করে করেছি রচন;
কুসুমের হার গেঁথেছি যতনে,
ছিঁড় দেখি আজ বীরত্ব কেমন? ২৮

"পারিলে না?—ছি ছি! সমরবিজয়ী!!
এই কি বীরত্ব? ট্রোজান সমরে,
বুঝিলে কেমনে? দেখ লীলাময়ী
অবলা রমণী ছিঁড়ে অকাতরে"—২৯

এত বলি তুলি কুসুমের রাশি,
ফুকারি ফুকারি শূন্যে উড়াইলা;
একি বিধি লীলা? পাগলের হাসি;
প্রকৃতি কি আজ উন্মাদ সাজিলা? ৩০

"কোথা যাও নাথ! হাসি ফিরে চাও,
দাসীরে ত্যজিয়া যে'ওনা আবার;
জীবন-সর্ব্বস্ব দাঁড়াও দাঁড়াও,
পতিনিন্দা পাপ বুঝিয়াছি সার!!৩১

"তুমি বীর পতি, বীরভার্য্যা আমি
এক বৃন্তে দুটি কুসুম ফুটিয়া;
পেয়েছি যে সুখ জানে অন্তর্যামী,
কেমনে নির্ম্মম যাইবে ত্যজিয়া? ৩২

"যেওনা যেওনা;—স্বচ্ছ সরোবরে,
একি শতমুখী জীবন উচ্ছ্বাস;
জ্যোতির্ম্ময়ী কান্তি কমল উপরে,
কুসুমের হার—প্রসূনের বাস। ৩৩

"একি লো বারুণী* বীর পতি মম
কোলে করি কেন প্রবিশ পাতাল?
শোণিতের স্রোত—বাড়ব দহন,
একি সব?—বুঝি ভাঙ্গিল কপাল!! ৩৪

"অই যে আবার চিতার অনল,
ইলিয়স তীরে জ্বলন্ত শ্মশান!
অশনি নিনাদে ধরণী চঞ্চল,
হাহাকার রবে ফাটিছে বিমান।" ৩৫

উঠিল শিহরি—ভাঙ্গিল স্বপন,
বিকল অমনি উন্মাদ-বাসনা;
জাগিল মরমে পূর্ব্ব বিবরণ;
হায়রে সকলি আশার ছলনা!! ৩৬

বিরল তারকা সুনীল আকাশে,
বিরল আঁধার উচ্চ তরু পরে;
বিরলে বিপিনে সুমধুর ভাষে,
গাহিছে বিহঙ্গ ললিত লহরে। ৩৭

উপন্যাস—কুললক্ষ্মী।

(গত প্রকাশিতের পর)

ললিত ও বিনোদ কুললক্ষ্মীর জন্য কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়া হরদেব বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। লোক দ্বারা সর্ব্বেশ্বরের বাটীতে গোপনে কুলর অনুসন্ধান করাইলেন। যে সংবাদ

* জলদেবী

পাইলেন, তাহাতে বিনোদের অনেক দিনের আশা চূর্ণ হইল! বিদেশী যদি বহুকালের পর স্বদেশে আসে, তাহার মনে কত আশা, কত সুখ, কত আনন্দ উপস্থিত হয়—বহুদিনের আত্মীয় জন দেখিবার আশায় হৃদয় কেমন অধীর হয়! তখন যদি সেই হতভাগ্য বাড়ীর নিকট যাইয়া দেখে তাহার সাধের বাড়ী ভস্মস্তূপ, মাতা পত্নী পিতা ভগিনী গৃহ-দাহে মৃত, তবে যেমন এক বারে তাহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যায়, বিনোদেরও অবস্থা সেইরূপ হইল। কুললক্ষ্মীর উন্মাদাবস্থার পরে নিরুদ্দেশ, তাহার মাতার সহিত সর্ব্বেশ্বরের পুনর্ম্মিলন ইত্যাদি কাহিনী বিক্রমপুরস্থ আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই জানিয়াছিল। দেশে এ সকল কথা এত রাষ্ট্র হইয়াছিল যে বিনোদের আর কিছুই শুনিতে বাকী রহিল না।

বিনোদ কুললক্ষ্মীকে অন্তরের নিগূঢ় প্রদেশে স্থাপন করিয়াছিলেন, সে মূর্ত্তি আর কেহ দেখিত না। বিনোদ ললিত ভিন্ন অন্যের নিকট সে নাম মুখেও আনিতেন না। তাঁহার সেই প্রাণ-প্রতিমার আজি এ দশা! বিনোদের ইহা অসহ্য হইল। ললিত বন্ধুর দুঃখে একবারে ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। কিন্তু বিনোদের যদিও অত্যন্ত গভীর দুঃখ হইয়াছিল—হৃদয় একবারে ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল, তথাপি তিনি স্ত্রীজনোচিত রোদন আশ্রয় করিলেন না। শৈশব হইতে ক্লেশ পাইয়া তাঁহার কষ্ট সহিবার যথেষ্ট ক্ষমতা জন্মিয়াছিল, তিনি মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন যদি পৃথিবীতে সরলা থাকে, তবে অবশ্যই সমস্ত দেশ খুঁজিয়া তাহাকে বাহির করিব, আর যদি তাহাকে না পাই তবে কি করিব? তবে কি করিব? এবড় বিষম সমস্যা। বিনোদ ঠিক্ করিয়া উঠিতে পারিলেন না, তবে কি করিবেন। অধিকাংশ প্রেমোন্মত্ত চিত্ত যেরূপ হৃদয়ের ধন বিহনে জীবন পরিত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিয়া থাকে, বিনোদও তাই স্থির করিলেন—যদি সমস্ত সংসার খুঁজিয়া কুলকে না পাই, তবে এ প্রাণহীন দেহ পতন করিব। এ সঙ্কল্পটী বড় শান্তি-পূর্ণ, অথচ পাপপূর্ণ, আত্মহত্যা মহা-পাপ। কার্য্য না করিয়া মনন করিলেও পাপ, কিন্তু ইহা প্রাণ-প্রিয় জনবিহীন দুর্ভাগ্য হৃদয়ের বড় শান্তিপ্রদ। যাহাকে প্রাণাপেক্ষা ভাল বাস, তাহাকে হারাইয়া থাকা বড় কষ্ট। কিন্তু মৃত্যু কাহারও ইচ্ছাধীন নয়। তুমি ইচ্ছা করিলেও মরিবে না, যাহার জীবনের জন্য কত ইচ্ছা করিতেছ তাহাকেও রাখিতে পারিবে না, সুতরাং মানুষ নিরুপায় হইয়া সঙ্কল্প করে জীবন পরিত্যাগ করিব; কাজে এ কার্য্য অনেকেই করে না; অবশ্য ইহা সৌভাগ্যের বিষয় বটে, তাহা না হইলে সংসার জনশূন্য হইত। বিনোদ ললিতকে বলিলেন "ভাই, তুমি আমার জন্য অনেক কষ্ট করিয়াছ, আর তোমাকে কষ্ট দিতে আমার বাসনা হয় না, তুমি তোমার

পিতা মাতার নিকট যাও। আমি যদি সরলাকে পাই, তবে কলিকাতায় যাইব। না পাইলেও এক বার তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইব, এখন আমাকে বিদায় দেও।"

ললিত বড় সুবুদ্ধি। তিনি বিবেচনা করিলেন বিনোদ এখন বড় ব্যাকুল হইয়াছে, তাহার মন অন্য দিকে না ফিরাইলে রক্ষা নাই। ললিত বলিলেন "বিনোদ! তুমি কি এতই নিরাশ হইলে, এক বার কি তোমার সরলার অন্বেষণও করিবে না, আমি প্রাণ থাকিতে তোমাকে ছাড়িয়া কোথাও যাইব না, তোমার সহিত আমিও তাহাকে খুঁজিব। একবার এস তাহার মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসি। আর শুনিলাম হেমবালা নামে নাকি তাহার এক ভগ্নী আছে, তাহাকেও দেখিয়া আসি।" বিনোদের মন একটু প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, বলিলেন "বড় উত্তম কথা, চল তাহাদিগকে দেখিয়া আসি।" ললিত কৃতকার্য্য হইয়া বিনোদকে লইয়া সাহবাজনগরে চলিলেন। কুলর মাতা বিনোদের কথা সকলি জানিতেন (বিনোদের জন্যই যে কুলকে ঔষধ দ্বারা পাগল করা হইয়াছে এবং কুল 'বিনোদ বিনোদ' করিয়াই কোথা চলিয়া গিয়াছে সকলি সর্ব্বেশ্বর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন)। সাধারণত ভাবিতে গেলে বিনোদকে দেখিয়া কুলর জননীর মন সুখী না হইয়া অসুখী হইবার কথা, কিন্তু তাহা হইল না। মাতৃস্নেহের এমনই অলৌকিক স্বভাব যে অন্য লোকে যাহা ভাবে তাহার বিপরীত দেখা যায়। বিনোদকে দেখিয়া তাঁহার মনে কন্যা-শোক শত গুণে বৃদ্ধি হইল, আবার বিনোদও কুলর জন্য তাঁহারি মত ব্যাকুল দেখিয়া অনেক শান্তিও হইল। যাহার জন্য কুল উন্মাদিনী ও গৃহত্যাগিনী, তাহাকে ভাল না বাসিয়া মাতার হৃদয় থাকিতে পারে না।

বিনোদের হৃদয় কিছুতেই শান্ত হইল না। ললিত তাহার সহিত কুলর সম্বন্ধে নানা রূপ আলাপ করিলেন। তাঁহারা যে কুলর অন্বেষণে দেশে দেশে ভ্রমণ করিবেন তাহা বলিয়া কুলর মাতার মন অনেক শান্ত করিলেন, কিন্তু বিনোদ শব্দটীও করিতে পারিলেন না।

হেমবালা যুবতী-জনোচিত লজ্জাবশতঃ আড়ালে থাকিয়া বিনোদ ও ললিতকে দেখিতেছিল। তাহার মা যখন ডাকিল, তখন মুখে লজ্জা মাখা একটু হাসি ও চোখে দুই ফোঁটা জল লইয়া পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার হাসিটুকু সুখের নয়, যুবতী রমণীর স্বভাবসিদ্ধ, এখন তাহা কোথায় মিশাইয়া গেল। দুটী চোক ছল ছল করিতে লাগিল, পরে বড় বড় ফোঁটায় চক্ষের জল পড়িয়া তাহার গোলাপবৎ গণ্ড দুটী সিক্ত হইতে লাগিল। এই বালিকার সরল মুখে শোকের অশ্রু দেখিয়া একটী হৃদয়ে বড় আঘাত লাগিল, ললিতের হৃদয় যেন একবারে গলিয়া গেল।

তাঁহার বাসনা হইল ঐ চক্ষের অশ্রুজল যতনে মোচন করেন। কিন্তু লজ্জা যেন তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিল। হেম যুবতী কি সরলা বালিকা, সহসা চিনা যাইত না—সে এই উভয় কালের মধ্যবর্ত্তিনী ছিল। বিনোদের হৃদয় এতক্ষণ শোক দগ্ধ হইতেছিল, চক্ষু হইতে এক বিন্দু অশ্রু পড়ে নাই, এখন এই সরলা বালিকার চক্ষের জলে তাহারও হৃদয় যেন গলিয়া গেল। বিনোদ অধীর ভাবে কাঁদিতে লাগিলেন, "সরলা! তুমি সেই সুখের বাল্য কালে আমার হাত ধরিয়া নাচিতে নাচিতে যখন আমাদের বাড়ী যাইতে, তখন যদি আমি মাকে ডাকিতাম, তবে অমনি অভিমান করিয়া বলিতে—বিনোদ দাদা! তোমার মা আছে আমার যে মা নাই, আমার মায়ের কাছে আমাকে যেতে দেও। আমি কত কথা বলিয়া তোমাকে ভুলাইতাম। আজি তোমার মা তোমার জন্য কাঁদিতেছেন। তোমার নির্দ্দয় পিতা তোমার জন্য ব্যাকুল হইয়া খুঁজিতেছেন, তোমার প্রাণের বোন হেম তোমার জন্য কাঁদিয়া আকুল, তুমি কেন সকল ছাড়িয়া চলিয়া গেলে? হায়, আমিই তোমার সর্ব্বনাশের একমাত্র কারণ। আমার জন্যই তোমার সকল কষ্ট। মাঃ আমিই আপনার কন্যার জীবনহন্তা, আমাকে এই পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। আমি সমস্ত সংসার খুঁজিব, যদি আপনার প্রাণের ধনকে পাই, তবে আপনার নিকট লইয়া আসিব। এই চলিলাম, বিদায় দিন, আমি আর এক মুহূর্ত্ত বসিয়া সময় কাটাইতে পারি না, সরলা জানিনা কোথায় পড়িয়া কত কষ্ট পাইতেছে, কে তাহাকে রক্ষা করিবে, আমি শীঘ্র যাইতেছি।" বিনোদ উন্মাদপ্রায় ছুটিল, ললিতও সঙ্গে সঙ্গে চলিল। মাতা কন্যা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। হেম এতদিন কুলর জন্য অভিভাবকদের ভয়ে প্রাণ খুলিয়া কাঁদিতে পারেন নাই। এখন আর সে ভয় নাই, বালিকা মাতার আদর পাইয়া একবারে ভয়শূন্য হইয়াছে, কুলর মাতা কত কাঁদিলেন, কতবার হেমকে বুকে করিলেন, তাহার হৃদয় তবু স্থির হইল না। একটি সন্তানের অভাব অন্য দ্বারা দূর হয় না, একের স্থান অন্য দ্বারা পূর্ণ হয় না। তবে লোক ভুলিয়া থাকে মাত্র। সর্ব্বেশ্বর কন্যার জন্য কলিকাতায় গিয়াছিলেন, বিনোদের মন এ কথায় প্রবোধ মানিল না, কেননা যে পিতা কুলাভিমানের দাস হইয়া আপন কন্যাকে পাগল করিতে পারে সে যে এখন এতদূর সদয়-হৃদয় হইয়াছে, সহসা কি বিনোদের অতদূর বিশ্বাস হয়?

বিনোদ দেশে আসিয়াও আপন বাড়ীতে না যাওয়াতে তাঁহার পিতা বড় রুষ্ট হইয়াছিলেন। পুত্রের কষ্টের বিষয় পিতা কিছু অনুমান করিতে পারেন নাই এমন নয়, তবে কিনা বুড়ারা অনেক সময় বুঝিতে পারিয়াও রাগ করেন, এটি যুবকদের ভাগ্যের

দোষ। ওদিকে ৩। ৪টী কন্যা বিনোদের গন্ধ পুষ্পের জন্য অবিবাহিতাবস্থায় কালযাপন করিতেছিল, তাহারা কুলীন-কন্যা—২০।৩০।৪০।৫০ বর্ষীয়া। বিনোদের পিতা শ্রোত্রীয়বংশীয়া কোন ধনী লোকের কন্যার সহিত বিনোদের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিলেন, এই বিবাহটীর পরে বিনোদকে অতগুলি কুলীন কন্যা বিবাহ করিতে হইত। জানি না অতগুলি বালিকা যুবতী বৃদ্ধা ইত্যাদির পাণিগ্রহণের ভয়ে কি কুললক্ষ্মীর প্রণয়পাশে বদ্ধ হইয়া বিনোদ বিবাহে বিরত ছিলেন। যে কারণেই হউক, পাঠিকা জানেন বিনোদ এখন পর্য্যন্ত বিবাহ করেন নাই। কুলীনের ছেলে বিবাহে বীতশ্রদ্ধ হওয়া আর চাকুরে ছেলে মরা সমান কথা, কেননা বিবাহই তাহাদের চাকুরী, জমীদারী, মহাজনী সকলি, সুতরাং বিনোদের প্রতি আর পিতার স্নেহ অবিচলিত থাকা বড় সম্ভব নয়। বিনোদের পরিবারের মেয়েরা বিনোদের জন্য সর্ব্বদা কান্নাকাটি করিত, বিনোদের মাতা স্বামীর ভয়ে পুত্রের নাম মুখে আনিতে পারিতেন না, কিন্তু তাঁহার প্রাণ পুত্রের জন্য আকুল হইত, তিনি দেবতার নিকট বিনোদ ও কুন্দর জন্য কত মঙ্গল কামনা করিতেন। (ক্রমশঃ)

পাকবিদ্যা।

সাধারণ সঙ্কেত।

রন্ধনে গুজরাটী এলাইচ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সমান পরিমাণে এলাচ ও দারুচিনি মিশাইলে গন্ধদ্রব্য বা গন্ধ মসলা হইয়া থাকে।

আস্ত ধন্যা ছয় ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া পরে তপ্ত বালিতে ভাজিয়া হাত দিয়া মাড়িয়া পরিষ্কার করিলে রন্ধনের ধন্যা প্রস্তুত হয়।

গোলমরিচ জলে সিদ্ধ করিয়া হাতে মাড়িয়া পরিষ্কার করিলে রন্ধনের মরিচ প্রস্তুত হয়।

সিকিভাগ লঙ্কা উক্ত মরিচের সহিত মিশ্রিত করিলে তাহাকেও মরিচ কহা যায়।

হিঙ্গু ১ তোলা, আদা ২ তোলা, মরিচ ৪ তোলা, জীরে ৮ তোলা, হরিদ্রা ১৬ তোলা, ধন্যা ৩২ তোলা একত্র করিলে বেসবার প্রস্তুত হয়। বেসবার পিষিয়া, জলে গুলিয়া ছাঁকিয়া লইলে যে জল পাওয়া যায় তাহাকে কাশমর্দ্দ কহে।

তৈল কিম্বা ঘৃতে বেসবার ভাজিয়া প্রক্ষেপের পর যে তৈল বা ঘৃত প্রস্তুত হয়, তাহাকে করাল কহে।

এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি প্রত্যেকে

২ ।মা, কর্পূর আধরতি; কস্তুরী ১ রোয়া, মরিচ ৪।।মাষা চূর্ণ করিয়া একত্র করিলে যে মিশ্রপদার্থ হয়, তাহাকে উদ্ধুলন কহে।

ঘুটের পোরে দুধ জ্বাল দিয়া সেই দুধে দই পাতিবে। ৬ ঘন্টার পর মাখন বাহির করিয়া অগ্নির তাপে ঘৃত প্রস্তুত করিলে ঐ ঘৃত সুগন্ধি ও সুখাদ্য হইয়া থাকে।

ব্যঞ্জন সকল বিচিত্র বর্ণ ও সুদৃশ্য করিবার জন্য, ঘৃতের নানা প্রকার রঙ করা হইয়া থাকে। এক সের ঘৃত, ৪ মাষা কুঙ্কুম চূর্ণ সহিত মৃদু তাপে বসাইলে ঐ ঘৃতের রঙ সুবর্ণের মত হয়। ৪ মাষা হিঙ্গুল চূর্ণ মিশাইয়া ঐরূপ তাপ দিলে রক্তবর্ণ, ৪ মাষা আল্‌তা জলে গুলিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া ঐরূপ করিলে অরুণ বর্ণ ও ৪ মাষা কুঙ্কুম ১ তোলা নারিকেল শাঁস ও একটা পাতিলেবুর রস দিয়া ঐ প্রকার তাপ দিলে বাদামি রঙ হয়।

চিনি ও লেবুর রস অথবা কোন সুখাদ্য অম্ল রস একত্র পাক করিলে যাহা প্রস্তুত হয়, তাহাকে পানক কহে।

বাসী মশলায় তরকারি রান্ধিলে তরকারি মিষ্ট হয় না। যেরূপ গোলাপ, জুঁই প্রভৃতি ফুলে এবং চন্দন ইত্যাদি সুগন্ধ দ্রব্যে এক প্রকার সুগন্ধি তৈল আছে, এই তৈল সহজে উদ্বায়ী। এই তৈলকে আমরা আতর কহি। সেইরূপ তেজপাত, দারুচিনি, এলাইচ, লবঙ্গ, ধন্যা, মউরি, জিরে, মরিচ, সর্ষপ প্রভৃতি মশলাতেও ঠিক সেইরূপ আতর আছে, এই আতর আঢাকা রাখিলে বা গরম করিলে ঠিক্ কর্পূরের মত উড়িয়া যায়। তরকারি রন্ধন হইলে আকা বা চুলা হইতে নামাইয়া, গরম মশলা দিয়া ঢাকিয়া রাখিতে হয়। যে বাসি বাটা মশলার আতর উড়িয়া গিয়াছে, তাহা তরকারিতে দিলে তরকারির আস্বাদ ভাল হয় না।

খেচড়ান্ন (খিচুড়ী।)

চাউল এক সের, ভাঙ্গা মুগের দাল এক সের, ঘৃত এক পোয়া, জীরে এক তোলা, মরিচ এক তোলা, তেজপত্র এক মাষা, আদা দুই তোলা, ধন্যা দুই তোলা, লবণ চারি তোলা, পেস্তা এক তোলা, বাদাম এক তোলা, কিশমিশ এক তোলা, লবঙ্গ দারুচিনি, এলাইচ ও কুঙ্কুম প্রত্যেক দুই মাষা। হাঁড়িতে চাউল ও দাউল দিলে জল উচ্ছ্বসিত হইয়া না পড়ে, এরূপ পরিমাণে জল দিয়া তপ্ত কর। জল উষ্ণ হইলে উহাতে চাউল ও দালী একত্র ঢালিয়া দেও। জীরে হইতে লবণ পর্যন্ত সমুদায় মসলা বাটিয়া দেও। সিদ্ধ হইলে আধ পোয়া ঘৃতে পেস্তা হইতে লবঙ্গ পর্যন্ত সমুদায় খণ্ড মসলা ও গন্ধ দ্রব্য খণ্ড ভাজিয়া উহাতে ঐ সিদ্ধ অন্নগুলি সন্তলন কর। পাঁচ মিনিট তাপের পর অবশিষ্ট ঘৃত দিয়া পাঁচ মিনিট তপ্তাঙ্গারে রাখ। কুঙ্কুম বাটা দিয়া পাঁচ মিনিটের পর নামাও। অন্যান্য দালীর সহিত খেচড়ান্ন প্রস্তুত করার প্রণালীও এইরূপ। (ক্রমশঃ)

সখিত্ব, প্রেম ও দেবভক্তি।

মনুষ্যের হৃদয় শৈশব হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত ক্রমোন্নতির আশ্রয়ে পরিবর্দ্ধিত হয়; এবং কোন এক স্বর্গীয় ভাবের অধীন না হইয়া থাকিতে পারে না। প্রায় প্রত্যেক মনুষ্যকেই শৈশবে পুত্তলিকার প্রতি, বাল্যে সখার প্রতি, যৌবনে প্রণয়ীর প্রতি, প্রৌঢ়ে বৈভবের প্রতি এবং বার্দ্ধক্যে ইষ্টদেবের প্রতি অনুরক্ত হইতে দেখা যায় এবং সকল মানুষই শিশুকালে মৃত্তিকাদি নির্ম্মিত পুত্তলিকাদি লইয়া, বাল্যে বালসখাতে অনুরক্ত হইয়া, যৌবনে প্রেমে উন্মত্ত হইয়া, প্রৌঢ়ে বিষয় বিভবের অধীনে মৃতকল্প হইয়া, অবশেষে বৃদ্ধাবস্থার যৎকিঞ্চিৎ কালের জন্য দেবভক্তিতে পুনর্জ্জীবিত হইয়া সর্ব্বশেষে মৃত্যুর কোমল আলিঙ্গনে অবসন্ন হয়। মনুষ্য এই রূপেই জীবনের প্রত্যেক পরিচ্ছেদে ও প্রত্যেক অঙ্কে আপনার ভাবাধীনতা দেখাইয়া, অবশেষে কোন এক অজ্ঞাতদেশে বা অমৃতময় লোকে গমন করে।

শৈশব ও বাল্যকালের কথা ছাড়িয়া দাও। প্রৌঢাবস্থার বিষয়লালসার কথাও ত্যাগ কর। যৌবনের প্রণয় ও বার্দ্ধক্যের দেবভক্তি, এই দুয়ের মধ্যে কাহার যশোগান করা উচিত, একবার তাহাই ভাবিয়া দেখ। বোধ হয় কেহই প্রেমকে এককালে তাচ্ছিল্য করিয়া উড়াইয়া দিতে বলিতে পারিবেন না। যে প্রেমের মোহে মুগ্ধ হইয়া দেবাদিদেব মহাদেব পর্য্যন্ত হিমাচলশিরে তপোমগ্ন হইয়াছিলেন—যে প্রেমের অমোঘ প্রভাবে স্বয়ং মহামায়াও কোমলাঙ্গে বল্কল ধারণ করিয়াছিলেন—যে প্রেমের সর্ব্ববিজয়ী প্রতাপে কঠোরহৃদয় যমও পরাভূত হইয়া সাবিত্রীর স্বর্গীয় আলিঙ্গনে মৃত সত্যবান্‌কে পুনরর্পণ করিয়াছিলেন,—সে প্রেমকে যে হঠাৎ কেহ দুর্ব্বল হৃদয়ের আমোদলালসা মাত্র বলিয়া বর্ণন করিবেন, তাহা পারিবেন না।

কোন এক কবি বর্ণন করিয়াছেন যে, প্রেমের একটীমাত্র অশ্রুবিন্দুতে মহাসাগর তরঙ্গায়িত হইতে পারে, একটী মাত্র দীর্ঘ নিশ্বাসে প্রবল ঝটিকা প্রবাহিত হইতে পারে, একটীমাত্র কটাক্ষে সপ্তম স্বর্গ পর্য্যন্ত আলোড়িত হইতে পারে,—স্পর্শ মাত্রে বিদ্যুতাগ্নি প্রজ্বলিত হইতেও পারে।

অন্য একজন কবি বলিয়াছিলেন যে, প্রেমময় ও করুণাময় ঈশ্বর যদি আপনার সারাংশ স্বরূপ প্রেমাগ্নি মানব হৃদয়ে অর্পণ না করিতেন, তাহা হইলে, এই সমস্ত মানব নিস্তেজ জড়পিণ্ড সমান হইয়া কাল যাপন করিত। সেই পরম পিতা পরাৎপর পরমেশ্বর যদি মনুষ্যকে

ভাল বাসিতে ও ভালবাসার প্রতিদান পাইতে লালায়িত করিয়া না রাখিতেন, তাহা হইলে এই জড় জগৎ জড়ই থাকিত, চেতন অচেতন সমান হইয়া যাইত।

আমরা সকলেই উল্লিখিত কবিগণের লিখিত বাক্যগুলি শিরোধার্য্য করিতে প্রস্তুত আছি এবং ইহাও স্বীকার করিতে সম্মত আছি যে, যৌবনের পার্থিব প্রেম বার্দ্ধক্যের দেবভক্তির এক প্রকার মহলা বা পরীক্ষা মাত্র। যৌবনে যাহার হৃদয় প্রণয়ের উত্তপ্ততরঙ্গে আলোড়িত হইল না, যৌবনে যিনি প্রেম সামগ্রীর সহবাসে থাকিতে পারিলেন না, পৃথিবীতে থাকিয়া নিষ্কলঙ্ক স্বর্গসুখ আত্মসুখে মিশ্রিত করিতে সমর্থ হইলেন না, বিচ্ছেদের দারুণ যন্ত্রণা সহ্য করিতে শিখিলেন না,—নিশ্চয়ই তিনি জীবনের কোন অবস্থাতেই দেবভক্তির চূড়ান্ত মহিমা অনুভব করিতে পারিবেন না।

সখিত্ব, প্রেম ও দেবভক্তি, এ সমস্তই এক উৎস হইতে উৎসারিত হয়, চিনিতে না পারায় লোকে নানা কথা বলে। কিন্তু ভাবিয়া দেখ, মনুষ্যের সেই যে এক অনির্ব্বচনীয় পদার্থের সহযোগে বাস করিবার বাসনা, সেই যে কি এক গুপ্ত পদার্থে সংযুক্ত হইয়া থাকিবার বাসনা, সেই যে কি এক অজ্ঞাত বস্তুতে লীন হইয়া থাকিবার বলবতী ইচ্ছা, সেই যে দুর্লভ্য ও অনির্ব্বচনীয় পদার্থের আদরে ও অনাদরে আপনাকে চরিতার্থ ও অভিসন্তপ্ত জ্ঞান করা,—জগৎ সংসারে শত সহস্র দ্রব্য ও শত সহস্র সামগ্রী আছে, কিন্তু সেই যে কি এক অনির্বাচ্য পদার্থ আছে, যাহার জন্য সকল মনুষ্যই ব্যাকুল, যাহার জন্য প্রত্যেক হৃদয় সর্ব্বক্ষণই লালায়িত। এইরূপে প্রত্যেক জীবের সেই একমাত্র উদ্দেশ্য ও একমাত্র লক্ষ্য স্থানটীই সখিত্ব, প্রণয় ও দেবভক্তির উৎস বা উৎপত্তি স্থান; এবং ঐ সমুদায় হৃদ্যভাব উহাদের অর্থাৎ সখিত্বের, প্রণয়ের ও দেবভক্তির উপাদান। যাহাকে তোমরা আজ কথায় "ভালবাসা" বল, তাহাকেই তোমরা সময় বিশেষে, অবস্থা বিশেষে ও কার্য্যবিশেষে সখিত্ব, প্রেম ও ভক্তিরূপে দেখ ও উদ্দেশ্য কর।

শৈশবের ভালবাসা পুত্তলিকায় গিয়া অঙ্কুরিত হয়, বাল্যের ভালবাসা বয়স্যে গিয়া পল্লবিত হয়, যৌবনে তাহা প্রণয়ী ও প্রণয়িনীতে গিয়া পুষ্পিত হয়, প্রৌঢ়ে তাহার কেশর (পাব্ড়ি) বিষয়বিভবে পড়িয়া শুষ্ক প্রায় হয়, অবশেষে বার্দ্ধক্যে তাহার সমস্তভাব তিরোহিত হইয়া এক আশ্চর্য্যতম ফল গঠিত হয়। অতএব, যাহা ভালবাসার চরম ফল, শিশুত্ব ও ক্রীড়াসক্তি তাহার বীজ, বাল্য ও সখিত্ব তাহার অঙ্কুর, যৌবন ও পার্থিব প্রেম তাহার পুষ্প, স্বর্গীয় দেবভক্তি তাহার উৎকৃষ্ট ফল।

মনুষ্যের হৃদয়ের স্বভাবসিদ্ধ শিক্ষা

প্রণালী পর্য্যালোচনা করিয়া দেখ, দেখিতে পাইবে যে, মনুষ্যের ভালবাসা অগ্রে সুন্দর, পরে সুন্দরতর, ক্রমে সুন্দরতম পদার্থের প্রতি প্রধাবিত হয়, ক্রমেই উন্নতির সোপানে অগ্রসর হয়। যাঁহাদের ভালবাসা সোপান ক্রমে ক্রমিক উন্নতির লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতে থাকে, তাঁহারাই সর্ব্বশেষে সেই অনির্বাচ্যতম মহান্ পদার্থের অনির্ব্বচনীয় ভাবে রোমাঞ্চকায় হইতে পারেন।

শৈশবকালে আমরা গোলাপ ফুল দেখিয়া প্রমোদিত হইতাম. ভাবে গদ্গদ হইতাম। কিন্তু অভ্রভেদী পর্ব্বতশ্রেণীর মহান্ ভাব কোন ক্রমেই হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিতাম না। বাল্যকালে আমরা কুমুদকহ্লারময় একটী সরোবর দেখিয়া যতদূর বিমোহিত হইতাম, একটী তরঙ্গাকুল সমুদ্র দেখিয়া কখনই সেরূপ মুগ্ধ হইতে পারিতাম না। ইহা সত্য বটে; কিন্তু এস্থলে ইহাও ভাবিতে হইবে যে, যে হৃদয় সেই কোমলতর বাল্যকালে সেই কমনীয়তম সরোবরের শোভা উপলব্ধি বা অনুভব করিতে সক্ষম হয় নাই, সে হৃদয় কোনকালেই সুবিশাল জলধিবক্ষের তর্জ্জনগর্জ্জনে উচ্ছ্বসিত হইতে সক্ষম হয় না। যে হৃদয় যৌবনে ভালবাসাতে মুগ্ধ হইল না, সে হৃদয় বার্দ্ধক্যেও দেবভক্তিতে পরিপূরিত হইবে না। ইহা সিদ্ধান্ত জানিবে।

অন্য এক উদাহরণ দেখ। মনুষ্য মাত্রেই প্রথমে প্রত্যক্ষ পদার্থের উপর হৃদয় সন্নিবেশ করিতে শিক্ষা করে। তৎপরে প্রত্যক্ষবৎ পদার্থে, অনন্তর অপ্রত্যক্ষতম আকাশের অভ্যন্তরে ও আত্মার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তৎপ্রতি আত্মার্পণ করিতে শিখে। সর্ব্বশেষে উচ্চতম আধ্যাত্মিক পদার্থে হৃদয় দান করিয়া পরিতুষ্ট হয়। সুতরাং বিবেচনা করিতে হইবে যে, যে মনুষ্য প্রথমে পার্থিবপ্রেমে মুগ্ধ হইতে শিখে না, আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিতে পারে না, সে কখনই দেবভক্তিতে হৃদয়োচ্ছ্বাস হওয়া অনুভব করিতে পারিবে না। এই সকল কারণেই অঙ্গীকার করিতে হইয়াছে যে, যৌবনের পার্থিব প্রেম বার্দ্ধক্যের দেবভক্তির মহলা বা পরীক্ষামাত্র। এই উচ্চতম পদবীতে যিনি একবার মাত্র পদক্ষেপ করিতে সক্ষম হইলেন, তিনিও দেবভক্তির অসীম ও পূর্ণতম আমোদ বোধগম্য করিতে পারিবেন। দেবভক্তির অসীম আমোদ একবার অনুভূত হইলে তখন আর পার্থিবপ্রেম ভালবলিয়া প্রতিপন্ন থাকিবে না। পার্থিব প্রেম তখন নিতান্ত তুচ্ছ বলিয়া মনে হইবে। দেবভক্তির উচ্ছ্বাস অত্যন্ত স্নিগ্ধকর, প্রগাঢ় ও আনন্দ পরিপূর্ণ। দেবভক্তির আনন্দ ভাবের সহিত পার্থিব প্রেমের উত্তপ্তও উন্মাদকর উল্লাসের তুলনা হয়না। অনন্ত শান্তিরসের আধার দেবভক্তির সহিত যখন উন্মাদকর উল্লাসের তুলনা করিবার ক্ষমতা জন্মিবে,

তখন তুমি মনে মনে পুরাণের লিখিত বৃদ্ধ রাজা যযাতিকে অত্যন্ত ঘৃণা করিবে। যযাতি রাজাও অবশেষে আপনাকে নিতান্ত মূর্খ ও ঘৃণার্হ মনে করিয়াছিলেন। তৎকালে তিনি কামভোগের সহিত শান্তিভোগের তুলনা করিয়া কএকটী গান রচনা করিয়াছিলেন, সে গুলি আজও "যযাতিগাথা" নামে প্রসিদ্ধ আছে।

যযাতি রাজার পূর্ব্বাপর অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে উত্তমরূপ বুঝা যায় যে, পার্থিব প্রেম সম্যক্‌রূপে পরিতৃপ্ত ও পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলেই প্রকৃতির নিয়মানুসারে তাহা ক্রমশঃই হ্রাস হইয়া আইসে এবং অবশেষে তাহাহইতে এক অপূর্ব্ব ফল উৎপন্ন হয় (অর্থাৎ আশ্চর্য্য দেবভক্তির আবির্ভাব হয়)। পার্থিব প্রেমের পূর্ণতার পর যে অচলা দেবভক্তি জন্মে, তাহা আর কিছুতেই ক্ষয় হয় না। তাহার কারণ এই যে, অনন্তকাল উপভোগ করিলেও আশ্চর্য্যতম দেবভক্তির সম্যক্‌ পরিতৃপ্ততা জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। চিরকালই তাহা বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে, কোন কালেই তাহার হ্রাস হইবার সম্ভাবনা নাই।

এ সম্বন্ধে আরও একটুকু ভাবা উচিত। পার্থিব প্রেমের বস্তু সকল আমার যথেষ্ট হিতাকাঙ্ক্ষী বটে; কিন্তু তাহারা আমাকে সকল সময়ে ও সকল অবস্থায় রক্ষা করিতে অক্ষম। আমিও তাহাদের উপর সকল সময়ে আত্ম নির্ভর করিয়া ভয়শূন্য হইতে পারি না। কিন্তু আমার ইষ্ট দেবতার কোমল অঙ্কে মস্তক রাখিয়া আমি চিরকালই নির্ভয়ে কাটাইতে পারিব, কোন কারণে আমাকে কখনও ভীত থাকিতে হইবে না। কখন কখন আমাদিগকে পার্থিব প্রেমের পদার্থ হইতে অসময়ে বিচ্যুত হইয়া আমরণ ভগ্নহৃদয়ে থাকিতে হয়, কাঁদিতেও হয়, কিন্তু দেবভক্তির প্রধান বস্তু ইষ্ট দেবতার সঙ্গে আমাদের একবার সহযোগ হইলে তাহা আর বিচ্ছিন্ন হয় না, বরং ক্রমশঃই তাঁহার সহিত আমাদের আত্মার ঘনিষ্ঠতা দিন দিন বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। এই মহান ভাবটী যিনি অন্ততঃ একবারও মনোমধ্যে আনিতে করিতে পারেন, অবশ্যই তিনি তদ্দণ্ডে কুমারিকা ক্রে দীক্ষিত ইলাইসার ন্যায় অন্ততঃ এক বারও মনে করিতে পারেন যে, আমি কি যৎসামান্য ও অকিঞ্চিৎকর ধূলি সমষ্টির উপর অমূল্য ভালবাসা স্থাপন করিয়া তাহাকে বৃথা বিনষ্ট করিলাম!

যাহাই হউক, ভাল বাসার চরম অবস্থা দেবভক্তি ও ঈশ্বর প্রেম এই দুই নাম প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহাতে সংশয় নাই। অতএব, যাহাতে আমরা শৈশব, বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্যক্রমে, ভালবাসা বৃত্তিকে উত্তমরূপে পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত করিয়া অবশেষে তাহার দেবভক্তি নামক শেষ অবস্থায় উপনীত হইতে পারি, তৎপক্ষে আমাদের সর্ব্বক্ষণ দৃষ্টি রাখা উচিত। মনুষ্য যখন দেবভক্তি

প্রসাদে এই পার্থিব দেহ ভুলিয়া যায়, অস্থি চর্ম্মাদির সমষ্টিজাত এই ভৌতিক কায়া বিস্মৃত হয়, এবং আপনাকে সেই অপূর্ব্বতম জ্যোতির্ম্ময় পরমাত্মার উপচ্ছায়া বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, তখনই সে ধন্য হয়, তখনই সে পাপ সংসারের সকল কামনা ও বন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়।

নূতন সংবাদ।

১। পণ্ডিতা রমাবাই বিলাতের চেলটেনহামের উচ্চশ্রেণীর স্ত্রীবিদ্যালয়ে সংস্কৃত শিক্ষয়িত্রী পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। এত দিনের পর তাঁহার গুণের উপযুক্ত পুরস্কার হইয়াছে।

২। আনন্দবাই যোশী আমেরিকাতে গিয়া পেনসিলবিনিয়ার স্ত্রীচিকিৎসা বিদ্যালয়ে ভরতি হন। তিনি তত্রত্য প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

৩। গত ১০ই জুন জেলা ২৪ পরগণার জয়পুর নামক গ্রামে কর্দ্দম বৃষ্টি হইয়াছে।

৪। দিল্লীতে এবার ক্রমাগত কয়েক বার এরূপ ভূমিকম্প হয় যে তাহাতে অট্টালিকাদি কিছুক্ষণ দুলিয়াছিল।

৫। কলিকাতায় গো-রক্ষিণী নামে একটী নূতন সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য প্রশংসনীয়।

৫। ফ্রান্সের কাম্বে ও আর্মেনটেয়ার নামক স্থানে বালিকাদিগের জন্য দুইটি কলেজ স্থাপিত হইয়াছে। বোর্দ্দোতেও একটী বিদ্যালয় হইবার প্রস্তাব হইয়াছে।

৬। লেডী রিপন, লেডী হোবার্ট, কুমারী রাই ও কুমারী মাকফর্লেন ১০ সহস্রের অধিক পুরুষ, স্ত্রীলোক ও শিশু দিগকে ইংলণ্ড হইতে তদীয় উপনিবেশে বাসস্থাপনের সাহায্য করিয়াছেন।

৭। হন নামক এক বিবী কন্যার মৃত্যুতে ভগ্নহৃদয় হইয়া দয়ার কার্য্যে জীবন সমর্পণ করেন। কুটীতে যে সকল বালিকা কর্ম্ম করে, তিনি লণ্ডনের সাউথ ওয়ার্কে তাহাদিগের জন্য এক আশ্রম করিয়াছেন। তাহারা অল্পব্যয়ে পরম সুখে তথায় থাকিতে পারিবে।

৮। ইউনাইটেড ষ্টেটসে বিবি মিলার নাম্নী এক স্ত্রীলোক সর্ব্বপ্রথমে জাহাজের কাপ্তেনীতে অধিকার পাইয়াছেন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। সঙ্গীত সংগ্রহ—বাউলের গাথা, ২য় খণ্ড, মূল্য ।৵০ আনা। এ পুস্তক খানিতে অনেকগুলি ভক্তি ও সুভাবপূর্ণ সংগীত সংগৃহীত হইয়াছে, ইহা দ্বারা ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তিদিগের বিশেষ উপকারের আশা করা যায়।

২। স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ক আপত্তিখণ্ডন—মূল্য /০ আনা। স্ত্রীশিক্ষার প্রতি যাঁহাদিগের কু-সংস্কার আছে,ইহা দ্বারা তাঁহাদের মনের অনেক ধন্ধ ঘুচিতে পারে।

৩। রাজপুত কুসুম—গীতিকাব্য, মূল্য ৮০ মাত্র। ইহাতে সুপ্রসিদ্ধ দ্বাদশটী রাজপুতবীরের কীর্ত্তি বর্ণনা আছে। লেখক যদিও ইহাতে তাঁহার কবিত্বের বিশেষ পরিচয় দিতে পারেন নাই, কিন্তু তাঁহার লেখা সরল ও প্রাঞ্জল এবং উদ্দেশ্য অতি প্রশংসনীয়। গ্রন্থকার উৎসাহ লাভের যোগ্য।

বামাগণের রচনা।

পরনিন্দা।

(গত প্রকাশিতের পর)

আরও এক শ্রেণীর পরনিন্দা আছে। বস্তুতঃ আমরা যখন কোন পরিচিত ব্যক্তির নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হই, তখন যে কেবল আপনাকে বড় বলিয়াই জানাইতে চাই, তাহা নহে। অনেক সময়েই প্রতারণার প্রতি ঘৃণা বশতঃ প্রতারকের নিন্দা করি; কপটতার প্রতি অশ্রদ্ধা বশতঃ কপটাচারীর নিন্দা করি; কৃপণতার প্রতি বিরাগ বশতঃ কৃপণের নিন্দা করি। আবার সদ্‌গুণ রাশির মধ্যে অতি অল্প দোষও গুরুতর বলিয়া প্রতীত হয়, এই জন্য গুণশালীর ক্ষুদ্র দোষকে বহু মনে করিয়া নিন্দা করি। কিন্তু গুণীরই হউক, নির্গুণেরই হউক নিন্দায় লাভ নাই, ক্ষতি অনেক। নিন্দা করিতে করিতে আমাদের অন্যের দোষানুসন্ধানের একটি অভ্যাস হইয়া যায়। যেখানেই যাই কেবল অপরের চরিত্রের ত্রুটিগুলি নিরীক্ষণ করি, তাহার গুণরাশির দিকে দৃক্‌পাত করি না। ক্ষুদ্রতা দর্শন করিতে করিতে হৃদয় ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে। সাধুর সহবাসে অপর দশ জন সাধুতা লাভ করে; হৃদয়ে একটী সাধু চিন্তা পোষণ করিলে, আর দশটি সাধু চিন্তা সে হৃদয়ে স্থান পাইবে; যিনি পরিচিত কোন ব্যক্তির একটি নিভৃত গুণ আবিষ্কার করিতে পারেন, তিনি আর দশ জনের দশটী সদ্‌গুণ অনুভব করিতে সমর্থ। অপরের গুণরাশি যে অনুভব করিতে না পারে—তাহার অবস্থা শোচনীয়। যেখানে আমরা গুণ উপলব্ধি করি, সেই খানেই গুণীর প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হই, এবং তাহার সহিত আত্মীয়তা করিতে সমুৎসুক হই। ক্রমে ক্রমে আমাদের অনুরাগের আকর্ষক সেই গুণগুলি অজ্ঞাতসারে আমাদিগের চিত্তমধ্যে অঙ্কুরিত হইতে থাকে। গুণীর প্রতি অনুরাগ মানুষের স্বভাবসিদ্ধ, ইহা অদৃশ্যভাবে মানুষকে গুণবান করে। যাঁহারা পরনিন্দা জীবনের একটি কার্য্যের মধ্যে গণ্য করেন, গুণগ্রাহিতার পরিবর্ত্তে পর-

ছিদ্রানুসন্ধানকে যত্নে হৃদয়ে স্থান দেন তাঁহাদের উন্নতির পথে গুরুতর অন্তরায়। আমরা যাহাকে ভালবাসি, তাহার সহস্র দোষ থাকিলেও সর্ব্ব সমক্ষে তাহার নিন্দা বাদ করিতে কষ্টবোধ হয়। সুতরাং যখন আমি কাহারও নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হই তখনই বুঝিতে হইবে যে সেই ব্যক্তির উপর আমার ভালবাসার অভাব আছে। যে যে পরিমাণে পরনিন্দাপ্রিয়, পরের প্রতি তাহার সেই পরিমাণে ভালবাসার অভাব। অন্যান্য কু-অভ্যাসের ন্যায় নিন্দা-প্রিয়তা দোষও প্রশ্রয় পাইলে ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; সুতরাং অল্পে অল্পে হৃদয়কে প্রীতিহীন ও শুষ্ক করিয়া তুলে। একটি সমাজের মধ্যে অনেকের জীবনেই অনেক ত্রুটি পরিলক্ষিত হইবে; এ সংসার সকলেরই শিক্ষাস্থল; কিন্তু যত্ন-পূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিলে প্রত্যেকের জীবন হইতেই কোন না কোন সদ্‌গুণের শিক্ষা লাভ করা যায়। পরদোষানুসন্ধানে ও পরনিন্দায় আমরা যতটা সময় নষ্ট করি, ততটা সময় যদি পরের গুণ পর্য্যবেক্ষণে এবং আত্মদোষানুসন্ধানে নিয়োগ করি তাহা হইলে জীবনের অনেক মঙ্গল সাধিত হইতে পারে। পরিশেষে বক্তব্য এই যে এতদ্দ্বারা দোষীর দোষের প্রশ্রয় দিতে বলা হইতেছে না। যদি কেহ কোন পরিচিত ব্যক্তির স্বভাবে কোন দোষ দর্শন করেন, অবস্থা বুঝিয়া তাঁহাকে সেই দোষের কথা অবগত করা তাঁহার পক্ষে কর্ত্তব্য। বন্ধুভাবে এক জনকে তাহার নিভৃত দোষ প্রদর্শন করা এক কথা, আর নিন্দা করিয়া সর্ব্বসমক্ষে তাহার হীনতার পরিচয় দেওয়া অন্য কথা।

অমিয় মূরতি।

জান কি ভগিনি! কাহার জীবন
ভাবিয়ে কাঁদিয়ে হতাশ হয়?
প্রত্যেক নিশ্বাসে, কোন্ অভাগিনী,
দেয়গো দুখের সু-পরিচয়?১

কনক নলিনী বিষাদেতে ভরা,
যাতনা জীবন্ত কালিমা মাখা,
সরলা রমণী অসুখী নিয়ত,
যেন শশধর, নীরদে ঢাকা।২

অমিয় মূরতি সরলতা মাখা,
বিষাদে ঢাকিয়ে রেখেছে মরি,
চিরদিন তরে, এবে অভাগিনী,
দিতেছে যেনরে প্রকাশ করি।৩

যেন সরোবরে সরো-সোহাগিনী,
সরোজী সুন্দরী ফুটিতেছিল,
সহসা মুদিল, তেমনি বালার,
বিষাদে বদন ঢাকিয়া গেল।৪

যেন আধফুট গোলাপ প্রসূনে,
পশি কীট, দাম ছিড়িয়া দিল,
হায়রে সুখের মুখ দেখা দিতে
একে একে দুখ সাজিয়া এল।৫

সুখ স্বাদ আর কেবা অনুভবে,
পড়িল রে চাপা জনম মত,
সুখ বহুরূপী নব সাজে সেজে,
অভিনয় আহা দেখালে কত।৬

যে সব জিনিষে কত দেছে সুখ,
তারাই আবার নূতন হয়ে,
অমৃতে গরল, শীতলে উত্তাপ,
করে কত লীলা কে দেখে চেয়ে ?৭

বালিকা বয়সে সুখের সহিত,
সুবাদ ঘুচিল জনম তরে,
কাঁদিতে কাঁদিতে জীবন যাইবে,
কে দেখে তাহারে চাহিয়া ফিরে ?৮

খেলা ধুলা ছাড়ি পশিতে সংসারে,
ছিঁড়ি সুখ-তার আর কে রাখে ?
হাসি খুসী মরি সকল পলা'ল,
চিরদিন তরে বদন থেকে।৯

জীবনে যাতনা, প্রণয়ে নিরাশ,
সুখেতে বিমুখী, কাতরা বালা,
মিটেছে তাহার সুখের বাসনা,
ঘুচেছে এবেরে সকল জালা !!১০

সুখশশী তাঃ গরাসিল রাহু,
সংসার আকাশ আঁধারময়,
প্রথম জীবন সাঁজের বেলায়,
ঘোর অন্ধকার—রাতে কি হয় ?১১

সোণার প্রতিমা মূরতি দয়ার,
তবুরে সংসারে সবার চোখে,
অমিয় হলেও গরল বলিয়া,
হায়রে তাহারে সকলে দেখে।১২

কেমন ললিত মধুর বচন,
প্রাণের সহিত বাসনা কত,
কত ভালবাসা, বাসেরে সকলে
তবুরে ক'জন তাহার মত ?১৩

সে জন সবার, তার কেহ নাই,
এমন মজার ব্যাভার কোথা,
প্রাণ যাবে তার ইহাও স্বীকার,
অপরে পাবেনা তিলেক ব্যথা।১৪

বসন ভূষণ, বিলাস বাসনা,
গিয়াছে সম্বন্ধ সবার সাথে,
দুঃখের মুরতি, শুধুরে কেবল,
ছেঁড়া ফুল যেন পড়িয়া পথে।১৫

কে আদরে আর ? কে আছে এমন,
যেনরে জগতে আদর নাই,
শুধুই বিষাদ, যাতনা কেবল,
যাবত্ত আদর পুড়িয়া ছাই !!১৬

এমন রমণী জগতে ক জন,
এত সহিষ্ণুতা হৃদয়ে কাহার ?
কে দেখেছে হেন ক্ষমার প্রতিমা,
একরূপে কাটে জীবন যার।১৭

কিবা সুখ আছে, নিরানন্দ সব,
বাঁচন মরণ কিঘোর দায়।
যা বল তোমরা কথাটিও নাই,
নীরবে সকলি সহিয়া যায়।১৮

কে দেখে চাহিয়া এমন রতনে,
তাতে মাথা ব্যথা আছে বা কার ?
বুঝেছ ভগিনি ! কেবা এই জন !
সাধের জীবন না যায় যায় !!১৯

যাহা কিছু ভাল জগতে আছেরে,
এতে অধিকার কি আছে আর,
এযে অভাগিনী বঙ্গীয়া বিধবা,
যাবত জীবন যাতনা সার।।২০

শ্রী——

কালনা।

SUPPLEMENT

TO THE

BAMABODHINI PATRIKA.

Toru Dutt—*(Continued.)*

Broken by this misfortune she finds a refuge on the love of Lefivre and dies just as she becomes a mother. We must not search in the Romance for an analysis of character very profound or powerful. It is a tragic and overwhelming subject, which required a Balzac or a George Eliot. But there are flashes and divinations which betray the poet. Thus when Lefivre comes back to offer his love and his heart to the poor despairing Marguerite, we find the following :—

"My God!" He murmured, "how I love you!" And he drew me to his heart.

A vague sentiment of happiness seized me as I leant my heavy head on the loving heart. It was the same feeling of happiness, which had seized me one day of old, when I was nearly drowning and my father jumped into the water and taking me up in his arms, clasped me to his breast.

The mother of the Count has become insane from grief. One of her boys is dead, the other is in prison. Spectres visit her dreams. "I am become very timid" she said, "ever since Dunois left me. Gaston comes sometimes to see me. I have such bad dreams at night, that I am afraid, and then I call and he comes."

But the quality which strikes above all in this work of a child, is, that which one would least expect in a young girl and especially a Hindu young girl—it is sobriety—that quality which extravagant India has never known. There are no developements at all. She does not give us but indications, that dominant quality by which minds really strong are recognised and become known.

The Sheaf Gleaned in French Fields, as a work of art, is perhaps the most interesting of Miss. Dutt's works. "It is," says an English critic, Mr. Gosse, the Editor of the Indian Ballads, "a wonderful mixture of strength and weakness, of genius over-riding great obstacles and of talent succumbing to ignorance and inexperience. The English verse is sometimes exquisite; at other times the rules of our prosody are absolutely ignored and it is obvious that the Hindu poetess was chanting to herself a music that is discord in an English ear." For the French reader the book has a peculiar charm, and is more living and more keenly musical (vibrant) than it can possibly be to an English reader. It is not without cause that it contains nothing, or almost nothing, of the poetry of the seventeenth or eighteenth century what could easily, however, have furnished many things superior to some of the pieces chosen by Miss. Dutt; it is, because she was really and above all, a French woman of our century, a French woman of our days, whose heart and imagination beat with all that agitates us at this hour. We are moved with a strange emotion when we find under these Anglo-Indian verses all these familiar names, and all these words of which the most ancient has scarcely entered into the past, but still form part of ourselves and of the present,—from Victor Hugo to Coppee, from Lamartine to Sully Pruddhome, from Leconte de Lisle to Theuriet, from Musset to Baudelaire, and so many, many others. It is a strange echo—the echo of the forts of Paris reverberated and coming back to us from Calcutta:

How grand they are,
These great watch-dogs that on the darkness bay!
(Comme c'est beau ces forts qui dans cette ombre aboient!)

Another charm of this work is that India pierces through it. A very beautiful thing it is when a critic has respired the flowers of many different countries,—when he can make many souls vibrate at once,—and when at each sound in his horizon, he hears awaken a thousand echoes from other worlds.

La cage sans oiseaux, la ruche sans abeilles
La mason sans enfants
The cage without birds,—the hive without bees
The house without children

awakens in the ear of the daughter of the Brahmans the cry of the Indian Rachel

तिष्ठेल्लोको विना सूर्यं
 शस्यं वा सलिलं विना ।
नतु रामं विना देहे
 तिष्ठेत्तु मम जीवितम् ॥

The world may live without the sun,
 The corn without the rain,
But as for me, my life is done,
 Till Rama comes again.

In her profound knowledge of our contemporary poets, Miss Dutt could advise and teach more than one of our French critics, and I do not know in England any one, who exhibits at once the same exactness of information in details, and a critical sense as delicate and as sure. This precision of knowledge—this honor of a near approximation, is again, another feature very rare in India and which astonished her father himself. In a page of charming simplicity Mr. Dutt relates how many times it happened to him to be taken in fault by the scientific regour of his child.

"She read much and rapidly, but she never slurred over a difficulty when she was reading. Dictionaries, lexicons, and encyclopædias, of all kinds, were consulted until it was solved, and a note taken afterwads, the consequence was that the sense became so imprinted in her brain, that whenever we had a dispute about the signification of any expression or sentence in Sanscrit or French or German, in seven or eight cases out of ten she would prove to be right. Sometimes I was so sure of my ground, that I would say—Well, let us lay a wager. The wager was ordinarily a Rupee. But when the authorities were consulted, she was almost always the winner. It was curious and very pleasant for me to watch her when she lost. First, a bright smile, then slim fingers patting my grizzled cheek, then perhaps some quotation from Mr. Barrett-Browning her favorite poetess like this :—

"Ah, my gossip, you are older, and more learned, and a man;" or some similar pleasantry.

II.

In the last volume of Miss Dutt, Ancient Ballads and Legends of Hindustan, India has decidedly got the upper hand. She entered, no doubt, into her period of originality. Genius can never be original except on its native soil.

To become the poet of India, she had the first gift—feeling and a love for the old things of the fatherland. Christian, fervent in spirit and by education, she had yet in one sense remained Hindu in her soul, doubtless she believed no more in Brahma, in Siva and in Vishnu, but she believed with all the faith and sanctity of her imagination in Sita, in Rama, and in all the heroes and all the heroines of twenty centuries of national legends. She wrote to Mlle Bader, "When I hear my mother sing an evening the old songs of our country, I weep almost always." Tears of a poet and which a poet alone can shed,—tears of Sidney hearing the blind beggar singing the song of Percy and Douglas popularly called Chevy Chase!—tears of Musset hearing wandering minstrels murmuring some old "Romance!" The genius of man plunges deep down into the dreams of childhood. The stories for children are the base of all poetry which comes from the heart. The last of the Indian Ballads, a small poem entitled Sita, gives us unconsciously the confession of this poetry which was rocked in the shadows of the great sheltering trees of Baugmaree, when the brother and the sister still lived.

SITA.

Three happy children in a darkened
 room!

What do they gaze upon with wide-open eyes?
A dense, dense forest, where no sun-beam pries,
And in its centre a cleared spot.—There bloom
Gigantic flowers on creepers that embrace
Tall trees; there, in a quiet lucid lake
The white swans glide; there, "whirring from the brake,"
The peacock springs; there, herds of wild deer race;
There, patches gleam with yellow waving grain;
There blue smoke from strange altars rises light,
There, dwells in peace, the poet-anchorite.*
But who is this fair lady? Not in vain
She weeps,—for lo! at every tear she sheds
Tears from three pairs of young eyes fall amain,
And bowed in sorrow are the three young heads,
It is an old, old story, and the lay
Which has evoked sad Sita from the past
Is by a mother sung ...... 'Tis hushed at last
And melts the picture from their sight away,
Yet shall they dream of it until the day!
When shall those children by their mother's side
Gather, ah me! as erst at eventide?

Ah! comme les vieux airs qu'on chartait à douze ans
Frappent droit dans les cœur aux heures de souffrance! ...
Comme els savent rouvrir les fleurs des temps passés
Et nous ensevelir, eux qui nous ont bercés! †

The ballads are in number nine. They are of unequal value. Two of them, the Royal Ascetic and the Hind, and Dhruva published in the life-time of Toru Dutt are among her first efforts, and can hardly be distinguished except by the novelty of the subject, from all the feminine poetry,—colourless enough,—with which English magazines abound. The same may be said of the Legend of Prahlada. The others,—though none presents an absolute perfection of form—offer all, a veritable interest, and at every moment reveals the poet. The dominant feature here, as in all her work is simplicity, sometimes powerful, often charming. Her history of Savitri, the Alcestes of India, more happy than her sister of Greece, opens with a grace which the original text does not possess, clumsily ornamented as that so often is by the pedantry and dullness with which the classical literature of India disfigures the most beautiful plots and out-lines of popular literature.

Savitri was the only child
Of Madra's wise and mighty King;
Stern warriors, when they saw her, smiled,
As mountains smile to see the spring.
Fair as a lotus when the moon
Kisses its opening petals red,
After sweet showers in sultry June!
With happier heart, and lighter tread,
Chance strangers, having met her, past,
And often would they turn the head
A lingering second look to cast
And bless the vision ere it fled.

* Valmiki.

† Ah! How the old airs we sung at twelve years
Strike strength to our hearts, and melt us to tears
In suffering's hour,—how these airs know to ope
The flowers of the past, when life's sun-beams slope,
And how they shroud us and bury us deep,—
Songs that erewhile had rocked us to sleep.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৩৫ সংখ্যা } শ্রাবণ ১২৯১—আগষ্ট ১৮৮৪। { ৩য় কল্প। ২য় ভা।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাবিবাহের উন্নতিসাধনার্থ পুনরুদ্যুক্ত হইয়াছেন এবং একটী কার্য্যালয় স্থাপন করিয়াছেন দেখিয়া আমরা যার পর নাই আহ্লাদিত হইলাম।

গুজরাটী ভাষায় "স্ত্রীবোধ" নামে একখানি সংবাদ পত্র প্রচারিত হইয়াছে। বিশেষ আহ্লাদের বিষয় এই, কয়েকজন শিক্ষিতা পারসী রমণী দ্বারা ইহা সম্পাদিত হইতেছে।

গত মে মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে অতিরিক্ত পরীক্ষা হয়, তাহাতে কুমারী প্রিয়তমা দত্ত নাম্নী একটী খৃষ্টীয় বঙ্গবালা এল এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

মধ্য ভারতবর্ষের অন্তঃপাতী জায়নাবাদ নামক স্থানে ব্লটিং কাগজ প্রস্তুত হইতেছে, এ দেশে ইহার এই নূতন দৃষ্টান্ত। বালি মিল হইতেও ক্রমে উৎকৃষ্ট মোটা শাদা কাগজ তৈয়ার হইতেছে। এ দেশে শিল্পোন্নতি হইলে আর বিলাতের মুখাপেক্ষা করিতে হইবে না।

শ্রীমতী কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় মেডিকাল কলেজে ৫ বৎসর কাল অধ্যয়ন জন্য মাসিক ২০৲ টাকা করিয়া বৃত্তি পাইয়াছেন। তিনি যে এক বৎসর পড়িয়াছেন, তাহারও জলপানী পাইবেন। শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর ক্রফট সাহেবের বিশেষ যত্নে এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে।

দাক্ষিণাত্যে কূর্গ নামক পার্ব্বত্য প্রদেশে সাঁওতাল জাতির ন্যায় এক জাতি বাস করে। পূর্ব্বে তাহাদিগের মধ্যে এক স্ত্রীর বহুপতি গ্রহণ ও অন্যান্য অসভ্যাচার প্রচলিত ছিল। ইংরাজ শাসনের অধীন হইয়া অবধি এই প্রদেশ-বাসিগণ বিদ্যা ও সভ্যতায় উন্নতি লাভ করিতেছে। তথায় ২০৩৮৫ জন বালকের মধ্যে ৪২৬৮ এবং ১৭৯৫৪ জন বালিকার মধ্যে ৪৩৩ জন শিক্ষা লাভ করিতেছে। ১৬ বৎসরের পূর্ব্বে বালক বালিকার বিবাহের নিয়ম নাই। বহুপতি বিবাহ উঠিয়া গিয়াছে।

মান্দ্রাজ মেডিকাল কলেজে যে ১০টী রমণী অধ্যয়ন করিতেছেন, তাহাদিগের বিশেষ বিবরণ এই :—

শ্রীমতী বান ইংগ্রেন উচ্চতর বিভাগের ৩য় বর্ষীয় শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছেন, শীঘ্র L. M. S. পরীক্ষা দিবেন। কুমারী ডেক্র ও কুমারী অবলা দাস ঐ বিভাগে ২য় বর্ষীয় শ্রেণীর, আগামী বর্ষে ডেক্র প্রথম M. B. E. ও C. M. পরীক্ষা এবং অবলা প্রথম L. M. S. পরীক্ষা দিবেন। কুমারী বাথোগাম দ্বিতীয় বিভাগের শেষ পরীক্ষা দিয়া ডাক্তারী করিবার যোগ্য বলিয়া প্রশংসা পত্র পাইয়াছেন। বিবী বরবুলী, স্মিথ ও ষ্টিওয়ার্ট প্রাইমারী পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীমতী গোবিন্দ রাজলু জেকব ও গর্জ্জিয়াজ সিং প্রথম বর্ষীয় পাঠ সমাপ্ত করিয়াছেন।

দাক্ষিণাত্যের হিন্দু বালিকাগণের উচ্চ শিক্ষার জন্য সার উইলিয়ম ওয়েডার বরণ যে দশ হাজার টাকা দিয়াছেন, তাহা পর্য্যাপ্ত নহে বলিয়া পুনার ব্রাহ্মণ-গণ আর ১০ হাজার টাকা সংগ্রহে সচেষ্ট হইয়াছেন।

লণ্ডনে "University Association of Woman Teachers" নামে এক সভা করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সুশিক্ষিতা রমণীগণ বিদ্যালয়ে ও পরিবার মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বেডফোর্ড কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপিকা বিবী আলিস গার্ডনার এই সভার সম্পাদিকা। সভ্যগণের মধ্যে যে বিষয়ে যাঁহার ব্যুৎপত্তি অধিক, তিনি সেই বিষয় উপদেশ দিতেছেন।

ফিলাডেলফিয়াতে স্ত্রীলোকদিগের রেসমী কার্য্যের উন্নতির জন্য এক সভা আছে, বিবী জন লুকাস তাহার সভাপতি। গত ২১ এ এপ্রেলে এতৎ সংক্রান্ত এক মহাপ্রদর্শনী খুলিয়াছে।

স্ত্রীলোকদিগের ভারত সভার সম্পাদিকা ফিলাডেলফিয়া-নিবাসিনী বিবি কুইণ্টন একটী বক্তৃতা করিয়া ভারতবর্ষের ইংরাজ শাসন প্রণালীর বিস্তর প্রশংসা করিয়াছেন, তাঁহার মতে ইহা দ্বারা সভ্যতা ও শিক্ষার উন্নতি হইয়াছে।

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ত্রীলোকদিগের ডিবেটিং ক্লবের সম্পাদিকা কুমারী আনা

স্বানউইক। এই সভায় সর্ব্ব প্রকার বিষয়ে মৌখিক তর্ক বিতর্ক হইয়া থাকে।

—

রোমে সেণ্ট পল্‌স হাউস নামে এক ভবন সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইহাতে শিক্ষিত ধাত্রী সকল প্রস্তুত হইতেছেন। ইটালীর যে কোন স্থানে ইহাঁরা পীড়িতদিগের শুশ্রূষার্থ নিযুক্ত হইতে পারেন।

—

জার্সী নগরের রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়িকা কুমারী এলেম ই মাল্‌ইস এক খানি সঙ্গীতপুস্তক প্রচার করিয়াছেন, অল্প দিনের মধ্যেই কেবল স্কটলণ্ডে তাহা ৬০বার মুদ্রিত হইয়াছে।

—

কুমারী এলেন ফ্রাইস সুইডেনের সহিত নিদারলণ্ডের রাজনৈতিক সম্বন্ধ বিষয়ে অতি সারগর্ভ প্রস্তাব লিখিয়া দর্শনাধ্যাপিকা (Doctor of Philosophy) উপাধি পাইয়াছেন।

—

মাডাম হীন নাম্নী এক বদান্যা রমণী অন্ধ শ্রমজীবীদিগের জন্য এক কার্য্যশিক্ষালয় খুলিয়াছেন, তাহাতে অন্ধ লোকেরা ঝুড়ী বোনা, মাদুর ও কার্পেট তৈয়ার প্রভৃতি কার্য্য শিখিবে। শিক্ষালয় খুলিবার দিনে তিনি অন্ধদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করান ও কিছু কিছু টাকার সহিত এক একটী স্বর্ণমুদ্রা বিতরণ করেন।

—

আমেরিকার ওয়াসিংটন মহানগরে "The Woman's National Relief Association" "স্ত্রীলোকের জাতীয় সাহায্য দান সমাজ" নামে এক সভা আছে, ওয়াসিংটনের প্রধান বিচারপতির পত্নী বিবী ওয়েট তাহার সভাপতি। ইহার বার্ষিক কার্য্য বিবরণে অনেক গুলি সাধু কার্য্যের উল্লেখ আছে। জাহাজ বুড়ী হইয়া বা অন্য কারণে জাহাজী ও আরোহী যাহারা দুরবস্থায় পতিত হয়, এই সভা শয্যা, বস্ত্র, ঔষধ ও পথ্যাদি দিয়া তাহাদিগের শুশ্রূষা করিয়া থাকে। ৭০টী আড্‌ডাতে এইরূপ সাহায্য প্রদান করা হইয়াছে। নাবিকদিগের হাঁসপাতালে পুস্তকালয় ও বস্ত্রালয় স্থাপন করিয়াও সাহায্য করা হইয়াছে। মিসিসিপি বন্যাতে যাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, এই সভা তাহাদিগের ক্লেশ নিবারণের চেষ্টা করিতেছেন। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, জলপ্লাবন, অগ্নিকাণ্ড, মারী ভয় বা অন্য কারণে বিপন্ন ব্যক্তিগণকে সাহায্য করা এই সভার উদ্দেশ্যের অন্তর্ভূত। মফস্বলের নানা স্থানে এই সভার শাখা সকল স্থাপিত হইয়াছে। সাধুকার্য্যে স্ত্রীলোকদিগকে সম্মিলিত করিয়া তাঁহাদিগের সমবেত চেষ্টা দ্বারা দেশের অভাব মোচন এই সভার উদ্দেশ্য।

—

পারিসে ৩০ হাজার স্ত্রীলোক নেকড়ার ফুল তৈয়ার করিয়া জীবিকা লাভ করে।

খরিদদার দোকানদারেরা গোলাপফুল অধিক মনোনীত করে। গোলাপফুল যিনি তৈয়ার করিতে পারেন, তিনি সকল ফুল নির্ম্মাণেই সমর্থ।

চিকাগোতে 'লেডিস ফর্টনাইটলী ক্লব' অর্থাৎ মহিলাগণের পাক্ষিক সভা ১০ বৎসর চলিতেছে। ইহার সভ্য সংখ্যা ১৫০ জন। পর বৎসর ইহার যে কার্য্য হইবে, একবৎসর পূর্ব্বে এক কমিটী দ্বারা তাহা স্থির হইয়া থাকে।

সালেম শিক্ষয়িত্রী বিদালয়ে সূত্রধরের কার্য্য শিখিবার একটী শ্রেণী আছে, অনেক বালিকা তাহাতে ভরতি হইয়াছে। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হাগার সাহেব স্বয়ং এই শ্রেণীর শিক্ষকতা কার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

কুমারী জেনেট টম্‌স তাঁহার পিতার জাহাজের নাবিকতা কার্য্য অনেকবার নির্ব্বাহ করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি নিউ ইয়র্কের নাবিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিয়া থাকেন। নাবিকদিগের শাস্ত্র স্বরূপ 'টম্‌স নাবিগেটর' নামক পুস্তকের কিয়দংশ ইহঁারই প্রণীত।

সেন্ট লুইস নামক একটী ধাত্রী-বিদ্যালয় কেবল স্ত্রীলোক দ্বারাই পরিচালিত হইতেছে। ইহার প্রথম বার্ষিক রিপোর্ট বড় সন্তোষকর।

ইউনাইটেড ষ্টেটসের ডাকবিভাগে যত লোক কাজ করিতেছেন, তন্মধ্যে বয়সে সর্ব্বকনিষ্ঠ কুমারী এবেলিন বেলিস। ইনি অয়েষ্টার বের পোষ্ট মিষ্ট্রেস।

নারী জীবন।

১ম। রমণী সমাজের নেত্রী।

রমণী সমাজের নেত্রী। রমণীগণই সমাজকে শাসিত ও পরিচালিত করেন। পুরুষ আইন কানুন রচনা করেন সত্য। পুরুষ এই সমুদায় বিধি ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত করেন সত্য। রাজসিংহাসনে অথবা যুদ্ধক্ষেত্রে, ব্যবস্থাপক সমাজে অথবা ধর্ম্ম সভায় পুরুষেরই প্রাধান্য, রমণীগণ প্রকাশ্যভাবে সচরাচর কার্য্য করেন না সত্য, কিন্তু তথাপি তাঁহারাই সমাজকে শাসন করেন।

বাষ্পীয় পোত চলে কিসে? বাষ্পের বলে। কিন্তু যে চাকা জলের উপর আঘাত করিয়া জাহাজকে তীরবেগে দেশ দেশান্তরে লইয়া যায়, তাহার গায়ে ত বাষ্প দেখা যায় না। জাহাজের কল কিরূপে কাজ করে, ইহা যাঁহার

কখনও অনুসন্ধান করিয়া দেখেন নাই, তাঁহাদের চক্ষুতে এই চক্রসংলগ্ন দাঁড়গুলিতেই জাহাজ চলে। সমাজের পক্ষেও সেইরূপ। যাঁহারা কেবল বাহির দেখেন,তাঁহাদের চক্ষে এই সমাজ চক্রও পুরুষের বলেই পরিচালিত হইতেছে বলিয়া দৃষ্ট হয়। কিন্তু যাঁহারা এই ব্যাপারের মূলতত্ব অনুসন্ধান করিয়া দেখেন, তাঁহারা জানেন পুরুষ অবলম্বন মাত্র, জাহাজের দাঁড় মাত্র, কিন্তু যে শক্তিতে সমাজ চলে,তাহা বহুলপরিমাণে রমণী হৃদয় ও রমণী চরিত্রজাত।

শৈশবের শিক্ষা প্রধান শিক্ষা। চারা গাছ যে ভাবে রোপণ কর, সেইভাবেই চিরকাল থাকে। ক্ষুদ্র চারা সুবিস্তৃত বৃক্ষে পরিণত হইবে, সহস্রাধিক শাখা প্রশাখায় পরিবৃত হইবে, লক্ষ লক্ষ ফুল ফলে সুশোভিত হইবে। কিন্তু রোপণ করিবার সময় তাহাকে যে ভাবে রোপণ করিয়াছ, তাহা কখনই পরিবর্ত্তিত হইবে না। মানব চরিত্রের দশাও তাহাই। শৈশবে তাহাতে যে ভাব ঢালিয়া দেওয়া হয়, শৈশবে তাহাকে যে দিকে অবনত করা যায়, শৈশবে যে আদর্শ তাহার সমক্ষে ধারণ করা যায়, সেই ভাবে,সেই দিকে, সেই আদর্শে চিরদিনই তাহা অল্পাধিক পরিমাণে সংগঠিত ও পরিচালিত হইবে। যৌবনের শিক্ষা, বার্দ্ধক্যের অভিজ্ঞতা কিছুতেই এই ভাবকে একেবারে উন্মূলিত করিতে সক্ষম হয় না।

রমণী মাতৃরূপে সমাজের মূলে বসিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার স্তন্য দুগ্ধে যেমন শরীর পোষিত ও বর্দ্ধিত হয়, তাঁহার হৃদয়ের ভাবে সেইরূপ চরিত্র গঠিত হয়। শৈশব জীবনে তিনিই সর্ব্বপ্রধান শিক্ষক। তাঁহার ভাব, তাঁহার চরিত্রের আদর্শ, আমাদিগের চরিত্রের অস্থি মজ্জাগত হইয়া আজীবন আমাদিগের উপর প্রচুর আধিপত্য বিস্তার করে।

মানুষ বলের বশ নহে, ভাবের বশ। সমাজ বলের শাসন মানে না, ভাবের শাসন মানে। এই ভাব কোথা হইতে আসে?—এই ভাব রমণী হৃদয়ের, মাতৃচরিত্রের। মাতৃচরিত্রের ছায়া আজীবন আমাদিগের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া আমাদিগের মত ও কার্য্যকে পরিমিত ও পরিচালিত করে।

জাতীয় চরিত্রে জাতীয় সমাজ পরিগঠিত ও পরিচালিত হয়। জাতীয় চরিত্র জাতীয় ভিন্ন ভিন্ন নরনারীর চরিত্রের সমষ্টি মাত্র। প্রত্যেক স্ত্রী-পুরুষের চরিত্র বহুল পরিমাণে তাঁহা-দিগের স্ব স্ব মাতৃচরিত্রের ছাঁচে গঠিত। জাতীয় চরিত্র সমাজের রমণীগণের চরিত্রের ছায়া মাত্র।

পাঠিকা ভগিনি! তোমার ক্ষমতা কত, একবার ভাবিয়া দেখ। তুমি ইচ্ছা, চেষ্টা, ও যত্ন করিলে সমাজকে স্বর্গের শোভায় বিভূষিত করিতে পার। তুমি ইচ্ছা করিলে তাহাতে নরকের দুর্গন্ধও ঢালিয়া দিতে পার। তোমার

চেষ্টা ও যত্ন থাকিলে হীন, দুর্ব্বল, অসৎ, কলঙ্কিত জনসমাজ মহৎ, সবল, সৎ, ও পবিত্র হইতে পারে। এই হতভাগ্য সমাজকে কি একবার তুলিয়া ধরিতে চেষ্টা করিবে না? ভগবান তোমাকে প্রভূত ক্ষমতাশালিনী করিয়াছেন, এস, বোন, সেই ক্ষমতার একবার সদ্ব্যবহার কর, ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ কর।

ব্রহ্মদেশ বিবরণ।

ধর্ম্ম।

ব্রহ্মদেশে প্রায় সর্ব্বত্র প্রত্যূষে উঠিবামাত্র সাধু লোকদিগকে দ্বারে দ্বারে দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং অন্যান্য বিবরণ দিবার পূর্ব্বে এ দেশের ধর্ম্ম-বৃত্তান্ত পাঠিকাদিগের অবগতি জন্য লেখা গেল।

বর্ম্মায়া সাধারণতঃ বৌদ্ধ, এখন খৃষ্টান সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে। বলা বাহুল্য, বৌদ্ধ ধর্ম্মের সঙ্গে অন্যান্য ধর্ম্মের একটী বিশেষ প্রভেদ এই যে ইহারা ঈশ্বরের অস্তিত্বে * বিশ্বাস করে না। ইহাদের মতে জীব সকল কর্ম্মদোষগুণে অনেক প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং শেষে নির্ব্বাণ বা মুক্তির অবস্থা লাভ করে। সর্ব্বসমেত এই রূপ ৩১ টী অবস্থা আছে, নিম্ন ৪ টী দণ্ডের অবস্থা, তাহা নরক, রাক্ষস বা জন্তুর অবস্থায় তাহা ভোগ করিতে হয়; ৫ম অবস্থায় মনুষ্য, এই অবস্থায় কর্ম্ম দোষ গুণের উপর তাহার ভবিষ্যৎ ভাগ্য নির্ভর করে। পরবর্ত্তী ৬ টী অবস্থায় নাট হইয়া কিঞ্চিৎ সুখের অবস্থায় থাকে, তাহার পর আর ২০ টী অবস্থায় ক্রমে উন্নত হইয়া শেষে নির্ব্বাণের অবস্থা লাভ করে।

গৌতম বৌদ্ধ ধর্ম্মের সংস্থাপক। তিনি মগধ দেশের রাজপুত্র। কথিত আছে অনেক অবস্থান্তরের পর তিনি, শেষে মনুষ্যের মুক্তির জন্য মানব জন্ম ধারণ করেন। তাঁহার জন্ম সময়ে ভূমিকম্প ও উল্কাপাত হয় এবং বৃক্ষ সকল আহ্লাদে তাঁহাকে সম্মান করিবার জন্য মুকুলিত হয়। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াই তাঁহার মাতা ও অপরাপর লোকদিগকে বলেন যে তিনি সর্ব্বজ্ঞ এবং পৃথিবীতে একটী বিশেষ পরিবর্ত্তন করিবেন। ভবিষ্যদবক্তারা তাঁহাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন তিনি ধর্ম্মে বা বলে জগৎ শাসন করিবেন। পাছে তিনি বৈরাগী হন, এই ভয়ে তাঁহার পিতা তাঁহার ১৬ বৎসর বয়সে বিবাহ দেন এবং তাঁহাকে সংসারাসক্ত করিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি

* বৌদ্ধদিগের মধ্যে ঈশ্বরবিশ্বাসী সম্প্রদায়ও আছে। স।

করেন নাই। বিবাহের পর ১৩ বৎসর তিনি সংসারাশ্রমে অতিবাহিত করেন, কিন্তু শেষে আর এ অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না। এক দিন তিনি একটী দন্তবিহীন বৃদ্ধকে দেখিয়া জীব সকল যে মৃত্যুমুখে রহিয়াছে তাহা বুঝিলেন, একটী কুষ্ঠরোগীকে কষ্ট পাইতে দেখিয়া বুঝিলেন যে মানুষ অসুখী এবং নাশের জন্য অগ্রসর হইতেছে। পরে মৃতদেহ সংকার জন্য লইয়া যাইতেছে দেখিয়া পূর্ব্বভাব আরও দৃঢ়বদ্ধ হইল। অতঃপর একটী প্রফুল্লচ্ছদয় ধার্ম্মিক লোককে দেখিয়া তিনি বুঝিলেন মানুষ এমন মন্দ অবস্থায় থাকিয়াও সুখী হইতে পারে। তিনি তখন আর সংসারবদ্ধ থাকিতে পারিলেন না। ধন মান পরিবার সকলই এক কালে পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী বেশে বাটীর বাহির হইলেন। প্রায় ২৫০০ বৎসর হইল এই ঘটনা হয়। গয়াতে (যে স্থানকে এখন বুধগয়া বলে) তিনি কিছু দিন গভীর ধর্ম্ম চিন্তায় কাটাইলেন, শেষে তিনি তাঁহার ধর্ম্ম প্রচারার্থ অনেক লোককে দলবদ্ধ করিলেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র, রাজা প্রজা সকলে একত্রিত হইতে লাগিল, জাতিভেদ একেবারে রহিত হইল,রাজা ও ব্রাহ্মণেরা দেখিলেন যে কেবল ধর্ম্মের জন্য দুঃখী শূদ্রেরা তাঁহাদের অগ্রগামী হইতেছে। স্ত্রীলোক দিগকে তিনি ভুলেন নাই, তাহাদিগের জন্য তিনি একটী স্বতন্ত্র দল করিলেন। পরে ৮০ বৎসর বয়সে তিনি দুইটী শাল বৃক্ষে হেলান দিয়া দেহ ত্যাগ করেন। তাঁহার দেহ সৎকার হইলে ভস্ম লইয়া অনেক স্থানে দেবালয় প্রস্তুত হয়, সে সকল স্থান এখন তীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

বৌদ্ধ ধর্ম্মে ৫ টী কার্য্য নিষিদ্ধ আছে, জীবের প্রাণ নাশ, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যা কথন ও মাদক সেবন। মানুষকে পতন হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশে বুদ্ধ দেবের যত চেষ্টা ছিল, তাহার উন্নতি সাধনের জন্য তত চেষ্টা ছিল না। তাঁহার মতে উক্ত পাঁচটী আপদ হইতে মানুষ রক্ষা পাইলে যথেষ্ট হইল, পরজন্মে আরও উন্নত হইবে এবং অবশেষে নির্ব্বাণের অবস্থা লাভ করিবে।

বর্ম্মারা দেবপূজা করে না, কেবল ধর্ম্ম পথে অগ্রসর হইবার উপায় স্মরণার্থ গৌতমের প্রতিমূর্ত্তি রাখিয়া থাকে এবং তাহাকে জীবিত গৌতমের ন্যায় সম্মান করিয়া থাকে—প্রণাম করে, ফল ফুল পত্র ও প্রজ্বলিত বাতি উপহার দেয় এবং দুঃখিলোক ও অন্ধদিগের জন্য মূর্ত্তির নিকট অন্ন ও পিষ্টকাদি ভোগ দিয়া থাকে।

বর্ম্মা দেশে ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে যাহা বলুন না কেন, সাধুদিগের শান্তমূর্ত্তি দেখিলে ভক্তি না করিয়া থাকা যায় না। লেখক এদেশে আসিয়া অবধি অনেক সাধুর সহিত আলাপ করিয়া তাহাদিগের নির্ব্বিরোধিতা সত্যনিষ্ঠা ইত্যাদি গুণে আকৃষ্ট হইয়াছেন। তবে কেবল ঈশ্বরে

তাহাদের বিশ্বাস না থাকায় দুগ্ধে গোমূত্রবৎ হইয়াছে।

সাধুদিগের ৫টী অবস্থা আছে যথা, ১ম কোহিন। পুরুষ এই অবস্থায় অন্ততঃ ৭ দিন অতিবাহিত না করিলে বর্ম্মায়া তাহাকে জন্তু অপেক্ষা উন্নত মনে করে না। হিন্দুদিগের উপনয়নের ন্যায় সকল বৌদ্ধ বালকের জন্য এ অনুষ্ঠান হয়। যজ্ঞের পূর্ব্বে বালকের কি কি কর্ত্তব্য, সে বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। নির্দ্দিষ্ট দিবসে বালককে উত্তমোত্তম বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত করিয়া ঘোড়ায় বা গাড়িতে চড়াইয়া রাজছত্র মস্তকোপরি দিয়া গ্রামের চারিদিকে লইয়া বেড়ান হয়, পরে যজ্ঞ বাটীতে তাহার অনুযাত্রী হইয়া সকলে ফিরিয়া আইসে। এখানে ফুসি বা সাধুরা আসিয়া উপস্থিত হন, ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে মন্ত্রপাঠ করেন, তখন তাহার রাজবেশ পরিবর্ত্তন করাইয়া মস্তকের লম্বা চুল কাটিয়া ক্ষৌরকর্ম্ম করা হয়। পরে বালক যোড়হস্তে জানু পাতিয়া ফুসিদিগের দলভুক্ত হইবার ইচ্ছা প্রকাশক মন্ত্র উচ্চারণ করে, তখন সরদার ফুসি ভিখারির হরিদ্রা বস্ত্র এবং ভিক্ষা পাত্র তাহার হস্তে দেন এবং তাহাকে দলভুক্ত করিয়া সঙ্গে লইয়া গ্রামের প্রান্তরে আপনাদের বাসস্থানে লইয়া যান। ফুসিদিগের সহিত বালক (এখন কোহিন) দ্বারে দ্বারে অন্ন ভিক্ষা করিবে, পায়ের নিকট হইতে ৪ হাতের অপেক্ষা অধিক স্থান দেখিবে না এবং কাহারো নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিবে না। গৃহস্থের দ্বারে আসিবা মাত্র গৃহস্থ বাটী বা চামচ করিয়া একপাত্র গরম অন্ন লইয়া আসিবে, ফুসিরা নিঃশব্দে আপনাপন পাত্রে তাহা গ্রহণ করিবে। ব্যঞ্জনাদিও এইরূপে লওয়া হয়। কিন্তু প্রায় সর্ব্বদা ফুসিরা নিজে না আসিয়া তাহাদিগের ছাত্রদিগকে বাটী ইত্যাদি একটী বাঁকে সাজাইয়া পাঠাইয়া দেয়। একটী ঘণ্টার শব্দ করিতে করিতে বালকেরা বসতি ফিরিয়া বেড়াইলে বসতিওয়ালারা আপনাপন অন্ন ব্যঞ্জন যথাস্থানে দেয়। এমনও দেখা গিয়াছে, ফুসি যে ভিক্ষা করিয়া আনেন, তাহা অধীনস্থ ছাত্রদিগকে দেন এবং গ্রামের কোন ধনবান ব্যক্তিপ্রেরিত অন্নব্যঞ্জন স্বয়ং ভক্ষণ করেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মের ৫টী নিষিদ্ধ ভিন্ন কোহিনদিগের আরো ৫টী নিষিদ্ধ আছে, যথা দুই প্রহরের পর ভোজন, নৃত্যগীত বাদ্য, মুখে রং করা, উচ্চ স্থানে উপবেশন এবং স্বর্ণ, রৌপ্য বা মুদ্রাদির সংস্পর্শ।

২য় পেটসিং ফুসি। কিছুদিন কোহিন অবস্থায় থাকিলে বালক পেটসিং অবস্থায় উন্নত হয়। এই রূপ হইবার সময় একটী যজ্ঞ করা হয়, তাহাতে অনেক ফুসি আসিয়া তাহাকে সাহায্য করে। কুষ্ঠ, কাশি বা রক্তমান্দ্য রোগী, জারজ পুত্র, ঋণী, ক্রীতদাস ও ২০ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক বালক মাতাপিতার অসম্মতিতে পেটসিং হইতে পারে না।

৩য় সেয়া ফুসি। প্রত্যেক ধর্ম্মমন্দিরে অনেকগুলি ফুসি থাকে, তাহাদিগের মধ্যে মন্দিরাধ্যক্ষকে সেয়া ফুসি বলে।

৪র্থ। অনেকগুলি ধর্ম্মমন্দিরাধ্যক্ষকে গাউং ফুসি বলে।

৫ম। ফুসিরাজকে তাতাসাজেইস বলে, দেশের রাজার শিক্ষকই এই পদ প্রাপ্ত হন সুতরাং নূতন রাজা হইলে নূতন ফুসিরাজও হইয়া থাকেন।

ফুসিদিগের মন্দির প্রায় গ্রামের বাহিরে হইয়া থাকে। দস্যুভয়ে প্রত্যেক গ্রামের চতুর্দ্দিকে মজবুত বেড়া দেওয়া থাকে, কিন্তু ধর্ম্মের ঘরে চোর প্রবেশ করিতে বিশেষ ভয় পায়, সেই জন্য ফুসিদিগের মন্দিরে কোন ভয় নাই। স্বাধীন বর্ম্মাদেশে দোষী এমন কি খুনি গিয়া ফুসিমন্দিরে প্রবেশ করিলে, তাহাকে সেই ঘর হইতে কেহ ধরিয়া আনিবে না। এই ঘর সকল বর্ম্মাদিগের সাধারণ গৃহের ন্যায় কাষ্ঠনির্ম্মিত, কেবল চালের উপর আবার ২। ৩ থাক চাল দেওয়া হয়। এইরূপ গৃহ দেখিলে ইহা ফুসিমন্দির বলিয়া সাধারণে জানিতে পারে। গৃহের মধ্যে একটী উচ্চস্থানে গৌতমের মূর্ত্তি থাকে, সম্মুখে ফুসি বসে ও সাধারণ লোকদিগের সহিত কথা বার্ত্তা কহে, পার্শ্বের একটী ঘর ভাণ্ডার ঘরের ন্যায় ব্যবহৃত হয়, আর একটী ঘরে ফুসি শয়ন করে, অপর স্থান সকল বালকদিগের পড়িবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

সতী মণ্ডপ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রাধামণি দাসী।

জেলা বর্দ্ধমানের অন্তর্গত ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের পার্শ্বে মানকর নামক গণ্ডগ্রামে প্রায় নবতি বর্ষ পূর্ব্বে কর্ম্মকার জাতীয় এক সামান্য গৃহস্থের ঘরে একটি আদর্শ সতী প্রাদুর্ভূতা হইয়াছিলেন। তিনি দুলালচাঁদ কর্ম্মকারের বনিতা, তাঁহার নাম রাধামণি দাসী। মানকরের প্রসিদ্ধ জমিদার মৃত বাবু হিতলাল মিশ্র মহাশয়ের প্রযত্নে রাধামণির স্মরণমণ্ডপ সেই গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পাঠিকা-দিগের মধ্যে যাঁহারা কখন মানকরে গমন করিয়াছেন, তাঁহারা বোধ হয় হিতলাল বাবুর কৃষ্ণগঙ্গা নামক সুদীর্ঘ সরোবরের সন্নিহিত বর্দ্ধমান বিভাগের স্কুলসমূহের সহকারী ডেপুটী ইনেস্‌পেক্টর মহাশয়ের বাসা বাটীর পার্শ্বে এই

সতী মহিলার মণ্ডপ দেখিয়া থাকিবেন। সন ১২১৪ অব্দে রাধামণি দাসী ইহলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার মণ্ডপোপরিস্থ প্রস্তরফলক দৃষ্টে আমরা তাঁহার মৃত্যুর বৎসর নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছি।

রাধামণির বাল্যাবস্থার বিষয় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত রহিয়াছে, সুতরাং আমরা অনেক চেষ্টা করিয়াও তৎ সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারি নাই। রাধামণি লেখা পড়া শিখেন নাই, কিন্তু বাল্যকালে যাত্রা, কথকতা প্রভৃতি শুনিয়া তাঁহার মনোমধ্যে দয়াদাক্ষিণ্যাদি সদ্‌গুণের আবির্ভাব হইয়াছিল বলিয়া একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। কেগুট নামক গ্রামে রাধামণির জন্ম হয়, তাঁহার পিতার নাম ভুবনমোহন কর্ম্মকার। তদানীন্তন প্রথানুসারে ভুবনমোহন আপন কন্যার ৮ বৎসর বয়ঃক্রমে মানকরের দুলালচাদ কর্ম্মকারের সহিত বিবাহ দেন। দুলালও মূর্খ ছিল, কিন্তু তাহার হৃদয় সাধারণ মূর্খের ন্যায় পাষাণবৎ কঠিন ছিল না। তখনকার কামারেরা কাস্তে, কোদাল, লাঙ্গল, গজাল, প্রেক, কুঠার, কড়া, খন্তা, ছুরী, কাটারি প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া বেশ দশ টাকা লাভ করিত, দুলালও সে সকল কর্ম্মে অপরিপক্ক ছিল না, সুতরাং শালিয়ানা তাহার আয় মন্দ ছিল না। শুনা যায়, চতুর্দ্দশ বিঘা জমার জমি, ৩ বিঘা নিষ্কর ভূমি, একটি পুকুর, ৭টি আমগাছ, দুইখানি ঘর, এক মরাই ধান্য এবং লোহার একটি দোকান এই তাহাদের সম্পত্তি ছিল। রাধামণির সহিত বিবাহ হইবার ৫ বর্ষ পর পর্য্যন্ত দুলালের বাটীতে লোক জনের অভাব ছিল না, কিন্তু তৎপর বৎসরকার ভয়ানক মহামারীতে সকলে মরিয়া যায়। এক্ষণে গৃহে কেবল দুলাল ও তাহার পত্নী রহিলেন। পাঠিকারা বোধ হয় জানেন, পিতা মাতা ভাই ভগ্নী সখী প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া নবপরিণীতা বালিকা দূরবর্ত্তী শ্বশুরালয়ে আসিলেই কাঁদিতে থাকে। এখনও এই কান্না কাটা আছে, কিন্তু তখন কিছু বেশি পরিমাণে ছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই রাধামণি মানকরস্থ শ্বশুরালয়ে আসিয়া একদিনের জন্যও কাঁদেন নাই এবং মরণ কাল পর্য্যন্ত পিতৃগৃহে আর কখনও গমন করেন নাই। দুলালচাঁদ বাহিরের সকল কার্য্য সম্পাদন করিতেন; রাধামণি পাক, জলোত্তোলন, গৃহ পরিষ্কার, বস্ত্রধৌতকরণ ইত্যাদি যাবতীয় গৃহকর্ম্ম একাকিনী নিষ্পাদন করিতেন। নিত্য নিত্য একপ্রকার পরিশ্রমজনিত কার্য্য করিতেন বটে, কিন্তু তথাচ কখনও তজ্জন্য তাঁহাকে বিরক্তা হইতে দেখা যায় নাই। দুলালচাঁদ যুবা বয়সে একটি-চক্ষুহীন হইয়া পড়েন। একদিন কার্য্য করিতে করিতে দক্ষিণ দিকের চক্ষুতে সতেজে এক লৌহকণা ছুটিয়া লাগে, ক্রমে তাহাতেই তাঁহার চক্ষু দর্শনশক্তিহীন হয়। দুলালচাঁদ এই ব্যাধিতে কেবল একটী চক্ষু হারাইয়াছিলেন তাহা নহে, ইহাতে

ক্রমে ক্রমে তাঁহার শরীর অত্যন্ত কৃশ ও বিবর্ণ হইয়া যায়। বোধ হয় চিন্তাই ইহার প্রধান কারণ। যাহাহউক, রাধামণির পতিভক্তি হিমালয়ের ন্যায় অটল, সুতরাং কিছুতেই বিচলিত হইবার নহে। তিনি সমভাবে পূর্ব্বের ন্যায় বরং তদপেক্ষা অধিক ভক্তির সহিত স্বামিসেবায় নিযুক্তা হইলেন এবং পতিকে সাক্ষাৎ দেবতা স্বরূপ জ্ঞান করিয়া তাঁহার প্রীতি সম্পাদনে ব্যস্তা রহিলেন। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত এইরূপে তাঁহার প্রতিমুহূর্ত্ত অতিবাহিত হইয়াছিল। উভয়ের চরিত্র অতিশয় নিষ্কলঙ্ক এবং উভয়ের বুদ্ধি বেশ মার্জ্জিত ছিল। তাঁহারা কখন কাহারও সহিত বিবাদ করিতেন না, অথবা কাহারও মনে কোন সময়ে অকারণ কষ্ট দিতেন না। উভয়েই গোঁড়া হিন্দু ছিলেন এবং উভয়ে যেন একমন, একপ্রাণ ও একদেহ হইয়া থাকিতেন। তাঁহাদের স্বর্গীয় প্রণয়ের কথাসকল বর্ণনা করিলে হৃদয় অপূর্ব্ব প্রীতি রসে বিস্ফারিত হইয়া উঠে এবং মনোমধ্যে এক অলৌকিক স্বর্গীয় ভাবের সঞ্চার হয়। রাধামণির দেবোপম সৌন্দর্য্য, ধীর স্বভাব, অনন্যসাধারণ পতিভক্তি, গৃহকর্ম্মে দক্ষতা, স্বভাবের উদারতা, মৃদু মধুর বচন, সন্তোষ এবং নয়নের উৎফুল্লতা ভাবিলে বোধ হয় যেন আমার চক্ষুর সম্মুখে স্বর্গীয় পবিত্র হৈম সিংহাসনে উপবিষ্টা হইয়া আদর্শসতী রাধামণি ভারতললনাদিগের উপরে দৃষ্টিপাত করিতেছেন, বোধ হয় যেন স্বর্গের সতী সখীগণ সহ মিশিয়া রাধামণি ভারতের সতীকুলদিগকে রক্ষা করিবার জন্য করুণাময় ঈশ্বরের নিকট বর প্রার্থনা করিতেছেন এবং তাঁহার চরিত্রের সৌগন্ধে দশদিক্ আমোদিত দেখিয়া যেন দেবতাকুল আনন্দে করতালি দিতেছেন। পাঠিকা! একটি পল্লীবাসিনী কামার জাতীয়া রমণীর সতীত্বের কথা শুনিয়া কাহার না হৃদয় আনন্দরসে স্ফীত হয়? যাহা হউক, ১২১৪ সালে ৪৫বৎসর বয়ঃক্রম কালে দুলালচাঁদ কর্ম্মকার ধনুষ্টঙ্কার রোগে দেহ বিসর্জ্জন করিলেন। রাধামণির বয়ঃক্রম তখন ৩৪ বৎসর ৭মাস হইয়াছিল। বৈশাখ মাসের ২৪এ তারিখে বেলা সার্দ্ধ দুই প্রহরের সময় মানকর গ্রামের সমগ্র ভদ্রলোক মিলিয়া দুলালের চিতাশয্যা প্রস্তুত করিলেন, ভারে ভারে সুগন্ধ চন্দনকাষ্ঠ আসিতে লাগিল, উত্তম ঘৃত, কুসুম, মসলা দ্রব্য, পুষ্পমালা, খই এবং ধাতু মুদ্রা বিবিধ প্রকার পাত্রে সজ্জিত হইল, অবশেষে পুরোহিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারই পশ্চাতে এলোকেশী বেশে ভূষণশূন্যা সতী রাধামণি! অঙ্গে অলঙ্কার নাই, মস্তকে তৈল নাই, কণ্ঠে কেবল পুষ্পের মালা এবং হস্তে আম্রশাখা। ঋত্বিকের কার্য্য সমাপ্ত হইলে পর রাধামণি চিতা শয্যায় স্বামীর পার্শ্বে শয়ন করিলেন। চিতা ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল; যুবক এবং যুবতীরা আনন্দে করতালি ধ্বনি ও

হরিনাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এই রূপে স্বামিসহমরণে রাধামণির আত্মা স্বর্গে চলিয়া গেল। আমরা সহমরণের পক্ষপাতী কিনা বলিতে চাহি না; কিন্তু চিরকাল কুলকলঙ্কিনী হইয়া জীবিতা থাকা অপেক্ষা স্বামিশয্যায় সহমরণে জীবনোৎসর্গ করা লক্ষগুণে শ্রেয়স্কর।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দত্ত।

নিদাঘ মধ্যাহ্ন।

১

গগন মাঝারে বসি কিরণ অনল,
তমোবিনাশন
ঢালিয়া ধরণী পরে—দহিতেছে সকলেরে,
স্থলচর জলচর নভশ্চরগণ;
তরু লতা আদি করি উদ্ভিদনিচয়
এ হেন বিমর্ষ তারা মৃত বোধ হয়।

২

আকাশে তাকাতে,পথে নিঃক্ষেপিতে পদ
শকতি কাহার?
পথের বালুকাচয়—ধান দিলে খই হয়,
জল দিলে বাষ্প উড়ে উপরে তাহার।
শিরোপরি দৃষ্টিপাতে ঝলসে নয়ন
তাহাতে দর্শনশক্তি হয় বিনাশন।

৩

হালিক বলদ সহ কৃষিবলগণ
অংসদেশে হল,
রৌদ্রে রৌদ্র বেশ ধরে,দেখে তায় ভয় করে
আসিছে বলদগণ অতি হীনবল,
স্খলিত চরণ, মুখে উঠিতেছে ফেণ,
অতি শ্রমে অতি ক্লান্ত মৃতপ্রায় যেন।

৪

ঘন দলে আবরিত তরুশাখা ঘরে
বিহঙ্গিনীগণ
তাপভয়ে লুকায়েছে,নানারবে ডাকিতেছে
তলেতে শয়ান তাপে ব্যথিত জীবন
পথিকে কহিছে যেন,—"ওহে পান্থবর,
শুনিয়া জুড়াও প্রাণ আমাদের স্বর।"

৫

করিপাল করিপৃষ্ঠে সাজাইয়া পালা
ঘন বন প্রায়,
অধীর হইয়ে তাতে,ডাঙ্গস মারিছে মাথে,
করিবর হয়ে অতি কাতর, তাহায়
ভূষিতেছে শুণ্ডজল করিয়া সিঞ্চন,
প্রহারের ভয়ে কর করি সঞ্চালন।

৬

অথবা বাতনা পেয়ে সেই করিগণ
সুকঠোর স্বরে
ত্রাসিত করিছে দেশ—ধরেছে ভীষণ বেশ
কাদা মাটী মাখি,বেগে আস্ফালিয়া করে
করস্থিত জলে দেহ করিছে সিঞ্চন;—
হাউয়ের শব্দ যথা শ্রবণভীষণ।

৭

সূচীমুখ স্থূলোদর অগম্য নয়ন,
বিকট আকার,
বরাহ তাপিত হয়ে,—জলমধ্যে প্রবেশিয়ে
কেবল নাসিকারন্ধ্র বাহিরে তাহার,
এমন কাতর ভাবে স্থকঠোর স্বরে
ডাকিছে, শ্রবণে দুঃখ হয়, ভয় করে।

৮

জ্বলন্ত প্রান্তরে দেখ মরীচিকা খেলা,
তরঙ্গ যেমন ;
শুনেছি বিজন স্থানে—মরীচিকা যেইখানে,
উত্তাপিত পিপাসিত বনমৃগগণ
জলভ্রমে তার প্রতি ধাবমান হয়ে,
পিপাসার শান্তি করে প্রাণ বিনিময়ে।

৯

সরোবর! এবে তুমি কত অংশ তাপে
তাপিয়াছ বল ?
আর কতক্ষণ পরে, ফুটিবে হে শব্দ কোরে
জলচরবাসভূমি তব এই জল ?
অথবা ভানুরে দিয়ে বাষ্পরূপ কর
করেছ সুস্থির বুঝি নিজ কলেবর।

১০

সলিল সুশান্ত এবে, সরঃ কোথা গেল
তোমার আশ্রিত
জীবকুল? সব করে, প্রাণ পরিত্যাগ কোরে
তোমায় কেরেছে নাকি শব্দবিরহিত ?
অসামান্য তব গুণে(১) কিম্বা জীবগণ
তলার শীতল জলে কোরেছে শয়ন ?

১১

হায় রে কি বিড়ম্বনা বসুধার আজি
দেখে হয় দুখ !
অন্ন জল দান কোরে, জীবে যে পালন করে,
তার আজি পিপাসায় ফেটে গেছে বুক,
স্নানের বসন কিম্বা পক্ষিপক্ষ হতে
চ্যুত জল পিয়ে প্রাণ রাখে কোন মতে।

১২

ব্যাকুল চাতককুল ডাকিছে বারিদে
কাতর রবেতে ;—
কিম্বা ডেকে বলিতেছে, চারিদিক পুড়িতেছে,
গৃহবাসী জনগণ, তপন তাপেতে,
কোন মতে এ সময় ছাড়িয়া নিলয়
বাহিরে এসোনা, পুড়ে মরিবে নিশ্চয়।

হিন্দুনারীর ব্রতবিধান।

ইংরাজী সভ্যতার উত্তমতা নিশ্চয়ের পূর্ব্বে এদেশে ধর্ম্মঘটিত যে সকল আচার ব্যবহার প্রচলিত ছিল এবং নারী জাতির মনে যে প্রকার ধর্ম্মভাব প্রতিষ্ঠিত ছিল —তদ্ভাবতের তালিকা স্বরূপ এই ক্ষুদ্র হিন্দু নারীর "ব্রতবিধান" প্রস্তাব লিখিত

(১) জলের তাপপরিচালকতা গুণ নাই ; একনা উপরিভাগ উষ্ণ হইলেও নীচের জল শীতল থাকে। নিম্নদেশ হইতে তাপ পাইলে পরিবাহন গুণ বশতঃ সমস্ত জল উষ্ণ হয়। এইটীই জলের অসামান্য ভাব।

হইল। পাঠক পাঠিকাগণ ইহা অপক্ষপাত হৃদয়ে পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন যে, হিন্দুরমণীর আচরিত ব্রতগুলি নিতান্ত কুসংস্কারপ্রসূত নহে, এবং অসারও নহে। ঐসকল ব্রত বিধির মধ্যে অনেক উচ্চধর্ম্মের আদর্শ নিহিত আছে এবং প্রধান প্রধান ধর্ম্মনীতির সারাংশ লইয়াই প্রস্তাবিত ব্রত বিধান গুলি নির্ম্মিত হইয়াছে।

১। গুপ্ত ধন ব্রত।

গুপ্ত ধন ব্রত কিরূপে অনুষ্ঠিত হয়, অগ্রে তাহাই বুঝান যাইতেছে। বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে একটী মোদকের মধ্যে একটী টাকা, কি একটী আধুলি, অথবা একটী সিকী গুপ্তভাবে স্থাপন করিয়া, কোন এক দরিদ্র ব্রাহ্মণকে আদর পূর্ব্বক আহ্বান করিয়া তদীয় হস্তে প্রদান পূর্ব্বক নমস্কার করা হয়। ব্রাহ্মণ বাটী গিয়া মোদক ভক্ষণের সময় তন্মধ্যে অর্থ প্রাপ্ত হইয়া চতুর্গুণ আনন্দ অনুভব করিবে, এবং গোপন ভাবে দান করিলে দানের যথার্থ ফল ও গর্ব্বশূন্যতা হইবে, ইহাই উক্তবিধ দান ব্রতের উদ্দেশ্য। এই ব্রতটী বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে গ্রহণ করিয়া এক বৎসর পর্য্যন্ত প্রতিমাসের পূর্ণিমায় ঐরূপ দান করিয়া অবশেষে পুনর্বৈশাখী পূর্ণিমায় গিয়া উদ্যাপিত করা হয়।

"দক্ষিণ হস্তে দান করিবে, বাম হস্ত যেন না জানে।" খৃষ্টের এই অমূল্য উপদেশ অপেক্ষা আমাদের দেশীয় নারীজাতির প্রতিষ্ঠিত গুপ্তধন ব্রত কোন অংশেই ন্যূন নহে। কি আশ্চর্য্য উদারভাব! বাম হস্তের জানা দূরে থাকুক, যে হস্তে দান করা হইতেছে, মোদকের মধ্যে দানীয় বস্তু স্থাপিত থাকায় সে হস্তও জানিতে পারে না। দানসম্বন্ধে এরূপ উদার ও উচ্চভাব বোধ হয় আর কোনও দেশে নাই।

২। জলছত্র।

জলছত্র ব্রতটী প্রতিবর্ষে বৈশাখ মাসেই অনুষ্ঠিত হয়। মহাবিষুব সংক্রান্তিতে অর্থাৎ বৈশাখ মাসের প্রারম্ভের পূর্ব্বে আরম্ভ করিয়া জ্যৈষ্ঠ মাসের কিয়দ্দিবস পর্য্যন্ত উক্ত ব্রতের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। অনুষ্ঠানের ইতিকর্ত্তব্যতা কিরূপ, তাহা বলা যাইতেছে।

সুশীতল জল, নারিকেল প্রভৃতি ফল, আসন, তাল বৃন্ত, ও শয্যা প্রভৃতি শ্রান্তিহর দ্রব্য লইয়া পথিকগণের গতায়াত প্রদেশে ও প্রান্তরস্থ বৃক্ষছায়ায় উপবিষ্ট থাকিতে হয়। পথিকগণ রৌদ্রে উত্তপ্ত হইয়া, পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া, নিকটে আসিবামাত্র উক্ত দ্রব্যাদিদ্বারা তাঁহাদের শ্রান্তি দূর করিতে হয়। বৈশাখ মাসের প্রথমাবধি জ্যৈষ্ঠের কিয়দ্দিবস পর্য্যন্ত প্রতি দিনই এতদ্রূপ জলছত্র ব্রত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কুলনারীরা স্বয়ং পথপ্রান্তে যান না, তজ্জন্য তাঁহারা ঐ কার্য্য নির্ব্বাহার্থ সাধু সচ্চরিত্র লোক-

দিগকে বেতন দিয়া নিযুক্ত করিয়া থাকেন।

বৈশাখ মাসের প্রখর রৌদ্রে পথিকগণের পথশ্রান্তি অধিক হইবে, তাহারা ঘর্ম্মাক্তকলেবর হইয়া ক্ষুধা তৃষ্ণায় ব্যাকুল হইবে, সেই সময় আমরা তাহাদের সাহায্য করিব, সুশীতল জল দিয়া তাহাদের তৃষ্ণা দূর করিব, উত্তম ফল মূল দিয়া তাহাদের ক্ষুধা শান্তি করিব, তালবৃন্ত বীজন করিয়া তাহাদের ঘর্ম্ম-শ্রান্তি নিবারিত করিব, তৎপরে তাহারা তথাহইতে যথা সুখে অভিলষিত স্থানে যাইবে,—এরূপ উচ্চমন, এরূপ উদার ধর্ম্মভাব, এরূপ দয়াশীলতা বোধ হয় ভারতবর্ষ ভিন্ন আর কোন দেশেই নাই। এই উদার ব্রত এক্ষণে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, ভোগ বিলাসের প্রাচুর্ভাবে এখন আর উহার আদর নাই বলিলেও বলা যাইতে পারে।

৩। প্রপাদান ব্রত।

প্রপা-শব্দের অর্থ জলপানের স্থান। পিপাসার্ত্ত পথিকগণ যে স্থানে বসিয়া জলপান দ্বারা পিপাসা শান্তি করে, তাদৃশ স্থান বিশেষের নাম প্রপা। পূর্ব্বকালে রেলগাড়ী ছিল না, সুতরাং লোকসকল পদব্রজেই গতায়াত করিত। দূরদেশে যাইতে হইলে পথিমধ্যে এমন সকল স্থান ছিল যে, ৩।৪ ক্রোশের মধ্যেও হয় ত জলবিন্দু লাভেরও সম্ভাবনা ছিল না। সেই সকল সঙ্কট প্রদেশে ভারতবর্ষীয় ধার্ম্মিক নরনারীগণ, পথপ্রান্তে ১বা ১॥০ ক্রোশ অন্তর এক একটী প্রপা অর্থাৎ পানীয়শালা স্থাপন করিতেন। একটী বৃহৎ কূপ, তাহা হইতে জল উঠাইবার যন্ত্র ও পাত্র এবং বসিবার একটী সুন্দর স্থান প্রস্তুত করা হইত। ইহারই নাম প্রপা অর্থাৎ পানীয়শালা এবং অদ্যাপি ইহা পশ্চিম প্রদেশে দৃষ্ট হয়।

এই প্রপাদান কার্য্যটী ব্রত বলিয়া গণ্য; কেমনা, প্রত্যহ নিয়তই ইহার প্রতি মনোযোগ রাখিতে হয়। এইরূপ লোক-হিতকর ব্রত অন্য কোন দেশে আছে কি না সন্দেহ।

৪। স্বামিসোহাগ ব্রত।

প্রথম রজস্বলা হইবার অর্থাৎ দ্বিতীয় বিবাহের পর, কোন এক সময়ে এই ব্রত গ্রহণ করিতে হয়। ইহার ইতিকর্ত্তব্যতা বা অনুষ্ঠান প্রকার বড় সহজ নহে। নারী যাবৎ না পুত্রবতী হইবেন, তাবৎ পর্য্যন্ত এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিবেন। ব্রতগ্রহণাবধি পতি ছাড়া হইতে পারিবেন না, পতির মঙ্গলার্থ প্রতিদিন প্রাতে গো, ব্রাহ্মণ ও দ্বিজাতিদিগকে পূজা করিবেন, পতির আজ্ঞা সাধ্য কি অসাধ্য তাহা বিচার না করিয়া বহন করিবেন, পতির ভুক্তাবশিষ্ট প্রসাদ দ্বারা জীবন ধারণ করিবেন, পতি শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া গৃহাগত হইলে পদপ্রক্ষালনাদি দ্বারা সেবা শুশ্রূষাদি

করিবেন। যাবৎ না পুত্রোৎপত্তি হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত এবম্বিধ কঠোর ব্রত বহন করিতে হয়। অত্যন্ত দুঃসাধ্য বলিয়া এ ব্রত এক্ষণে লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে। লোপ প্রাপ্ত না হইলে এ ব্রতের দ্বারা পতিগণের বিলক্ষণ উপকার সাধিত হইত এবং পত্নীগণেরও সতীত্ব বৃদ্ধি হইত, তৎপক্ষে সংশয় নাই।

পূর্ব্বকালের ভারতরমণীরা পাতিব্রত্য ধর্ম্ম সম্বন্ধে অত্যন্ত সুদৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। এই ধর্ম্ম প্রতিপালনার্থ তাঁহারা প্রিয়তম প্রাণকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। এই জন্যই এরূপ কঠোরতর ব্রতের সৃষ্টি হইয়াছিল। বর্ত্তমান রমণীরা এ ব্রত প্রতিপালনে নিতান্ত অসমর্থা। কেননা ইহাঁরা এক্ষণে দেশোচিত ও কালোচিত সভ্যতার বশীভূতা হইয়া বিলাসবতী ও ক্লেশবহনে অসহিষ্ণু হইয়াছেন।

৫। বীর পঞ্চমী।

ভাদ্রমাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে এই ব্রতের অনুষ্ঠান আরম্ভ হইয়া ৮ বৎসর পর্য্যন্ত প্রতিভাদ্রের পঞ্চমী তিথিতে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইহাতে বীরশ্রেষ্ঠ মহাদেবের ও বীরপত্নী পার্ব্বতীদেবীর পূজা করিতে হয়। পূজাশেষ হইলে বীর পুত্র কামনায় পতিপূজা করিতে হয়। যাবৎ না এই ব্রত সমাপ্ত হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত ব্রতধারিণীকে শুচি, ও উৎসাহযুক্তা থাকিতে হয়। পতিকেও তাবৎ পর্য্যন্ত শুচি ও সমাহিত হইয়া কালযাপন করিতে হয় এবং পাছে চিত্ত অশুচি হয় বলিয়া পরপত্নীর রূপলাবণ্য দর্শন পর্য্যন্ত বর্জন করিতে হয়। পত্নীকেও ঐরূপ ব্যবহারের অধীন থাকিতে হয়। নির্দ্দিষ্টকাল ব্যতীত অন্য সময়ে পতির সংসর্গ নিষিদ্ধ। এরূপ অবস্থায় কাল যাপন করিলে ইহার ফলস্বরূপ বীরপুত্র লাভ হয়। পূর্ব্বে হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকেরা এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিত। বাঙ্গালী রমণীর এ ব্রত প্রতিপালন সাধ্যায়ত্ত নহে।

হিন্দুস্থানী রমণীরা বীরপুত্র লাভকে নারীজীবনের সুফল বা সার্থক্য বিবেচনা করে। বীরপুত্র লাভের নিমিত্ত তাহারা একটী কৌতুকজনক অনুষ্ঠান করে। বালকের ষষ্ঠী পূজার সময়, সূতিকা গৃহে, হিন্দুস্থানী রমণীরা একখানি তীক্ষ্ণ তরবারি স্থাপন করে। তাহাদের মনোভাব ও প্রার্থনা এই যে, "ইও লেড়কে একঠো সিপাই হোগী।" এই বালক যেন একটী সিপাই হয়। এমন কি তাহার পুত্র ক্ষুদ্রকায় হইবে ভাবিয়া কোমরে বস্ত্র বন্ধন করে না অর্থাৎ কাপড় কসিয়া বা আঁটিয়া পরে না। তজ্জন্য তাহাদের উদর কিছু বড়। আমাদের দেশের কৃশোদরীরা তৎকারণে তাহাদিগকে দেখিয়া হাস্য করেন। ফলতঃ হিন্দুস্থানী রমণীগণের উদ্দেশ্য আমাদের বিবেচনায় মন্দ নহে।

৬। আলোকদান ব্রত।

আশ্বিন মাসে বর্ষার শেষ হইলে, কার্ত্তিক সংক্রান্তিতে আরম্ভ করিয়া অগ্রহায়ণ সংক্রান্তি পর্য্যন্ত প্রতিদিন সন্ধ্যার সময়, গৃহে, চত্বরে, চতুষ্পথে, বৃক্ষতলে, প্রাচীরে ও আকাশে আলোক বা প্রদীপ দান করার নাম আলোকদান ব্রত। এই ব্রতটী বালক বালিকা, যুবক যুবতী, বৃদ্ধ বৃদ্ধা, সকলেরই করা কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত আছে। এই ব্রতের দ্বারা আপাততঃ সাংসারিক লোকের কোন উপকার দেখা যায় না বটে; পরন্তু মনোযোগ সহকারে ভাবিয়া দেখিলে ইহার বিশেষ উপকারিতা আছে বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হয়। বর্ষার শেষে ও হিমপাতের প্রারম্ভে নানা প্রকার কীটের উৎপাত হয় ও বায়ু কিছু দ্রব্য-ভাবে বা অহিতকর হইয়া প্রবাহিত হয়। বিবেচনা হয় যে, আলোক প্রজ্বলন দ্বারা উক্ত উভয়বিধ উৎ-পাতেরই উপশম হইতে পারে। সমস্ত রাত্রি অথবা মধ্য রাত্রি পর্য্যন্ত দীপ প্রজ্বলিত রাখিলে তাহাতে অনেক কীট নষ্ট হয় এবং নিরন্তর ভূরি অগ্নিসংযোগ-বশতঃ দূষিত বায়ুরও দোষ ক্রমে নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং উক্ত ব্রতের অনুষ্ঠান কোন ক্রমেই একবারে বিফল নহে।

৭। ধনগচ্ছানি ব্রত।

বৈশাখ মাসের প্রারম্ভ দিবসে এই ব্রত গ্রহণ করিতে হয়। বিবাহের পর, পুত্রোৎপত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত এই ব্রত অনুষ্ঠান করিতে হইবে, পুত্র হইলে আর এ ব্রত গ্রহণ করিবার আবশ্যকতা নাই। ব্রতের প্রণালী এইরূপ:—

কোন ব্রাহ্মণ কি পতি কি অন্য কোন সদ্ব্যক্তির হস্তে বৈশাখ মাসের সংক্রান্তি দিবস হইতে জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তি পর্য্যন্ত প্রতিদিন কড়ি, ধান্য, মূল, মোদক, দক্ষিণাসহ প্রদান করিবেক। আগামী বৎসরেও এই রূপ অনুষ্ঠান করিবেক। ক্রমে চারি বৎসর পর্য্যন্ত এইরূপ দান করিয়া উদ্‌যাপন দিবসে প্রথম গ্রহীতাকে বস্ত্রাদি প্রদান দ্বারা পরিতুষ্ট করিবেক। এ ব্রতটী দানঘটিত, সুতরাং ইহাও নিষ্ফল বা মন্দ নহে।

ভাবিয়া দেখুন, উল্লিখিত ব্রতের অভ্যন্তরে কেমন একটী সুন্দর ধর্ম্মভাব আছে। বালিকা কাল হইতেই যে দানা-ভ্যাস করা কর্ত্তব্য, এবং ত্যাগ সহিষ্ণুতা শিক্ষাকরা আবশ্যক, এই ব্রতের দ্বারা তাহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে।

উপন্যাস—কুললক্ষ্মী।

(গত প্রকাশিতের পর।)

ললিত ও বিনোদ দুইজনে কুললক্ষ্মীর অন্বেষণ করিয়া বিক্রমপুরের গ্রামে গ্রামে ঘুরিলেন, কোথাও তাহার কোন সন্ধান করিতে পারিলেন না। তাঁহারা প্রত্যেক বাড়ী বাড়ী জিজ্ঞাসিলেন, প্রত্যেক জঙ্গল পর্য্যন্ত লোকদ্বারা তল্লাস করাইলেন, কুল কোথাও নাই। ললিত ও বিনোদ একদিন একটী বড় দীঘির ধারে নিরাশ হইয়া করতলে কপোল রাখিয়া বসিয়া আছেন, তাঁহাদের মস্তকোপরি সন্ধ্যাকালীন রক্তাভ আকাশ, নিকটে সুবিস্তৃত স্বচ্ছ রুচির দর্পণবৎ দীর্ঘিকা। বিনোদ এক একবার ললিতের মুখের পানে চাহিতেছেন আর বার চক্ষের জল মোচন করিতেছেন। অদূরে রমণীদের মলধ্বনি শ্রুত হইল। গ্রামস্থ ভদ্র রমণী ও কুলীনকন্যাগণ এই দীঘিতে সর্ব্বদা জল লইতে আসিতেন। ললিত বলিল "ভাই! এস আমরা এই রমণীদের কথোপকথন অন্তরাল হইতে শুনি, যদি সরলার কথা কিছু শুনিতে পাই। দেখ আমাদের দেখিলে উহারা কিছুই বলিবে না, জিজ্ঞাসিলে লজ্জা বশতঃ শব্দমাত্র করিবে না।" বিনোদ অনিচ্ছায় সেখান হইতে সরিয়া দুটী বড় বড় আমগাছের আড়ালে যাইয়া দাঁড়াইলেন, ললিতও লুক্কায়িত হইলেন। রমণীগণ নানা প্রকার আলাপ করিতে করিতে ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, ঘাট আলো হইল। কেহ জলের সহিত অঙ্গ মিশাইয়া রাঁধিবার ক্লেশ দূর করিতে লাগিলেন। প্রাচীনা রমণীগণ সন্ধ্যা দেবীর আরাধনা করিতে বসিলেন। একটী যুবতী বলিল "বিনোদা! সে দিন এ ঘাটে যে একটী মেয়ে দেখেছিলাম তা শোন নাই। আহা ভাই, তেমন সুন্দর মেয়ে আর কখন দেখি নাই। আমি ঠিক্ এমন সময় ঘাটে জল নিতে এসেছিলাম, দূর হইতে দেখি কতকগুলি এলো চুল মাথায় একটী মেয়ে বুকজলে দাঁড়াইয়া আকাশের পানে চাহিয়া দুটী হাত বুকের নিকট যোড় করিয়া রহিয়াছে। আমি তাহার কাছে যাইয়া দাঁড়াইলাম, সে শব্দও করিল না, দেখিলাম তাহার দুটী চক্ষের জলে মুখখানি ভাসিতেছে। মেয়েটীর পরা ছেঁড়া কাপড়, কিন্তু ভাই তাকে ছোট লোকের মেয়ে বলিয়া বোধ হইল না, অবশ্যই কোন ভদ্র লোকের মেয়ে হইবে। আমি বলিলাম তুমি কেগো, আমাদের পাড়ায় ত তোমাকে আর দেখি নাই? আমার কথা শুনিয়া আমার পানে একটু চাহিয়া জলে সাঁতার দিল, আমার সাহস তো জান

আমি সহজে ছাড়িবার পাত্রী নই। আমিও কলসী রাখিয়া জলে নামিলাম, সাঁতার দিলাম, সাঁতারিয়া তাহার কাছে গেলাম। মেয়েটী আমার গলা জড়াইয়া ধরিল—তখনও আমার সাহস ভঙ্গ হয় নাই, কিন্তু সে আমাকে জলে ফেলিয়া পলাইবার যোগাড় করিল। আমি তবু সাহসকে ছাড়িলাম না, আমি বলিলাম ভাল লোক তো তুমি, অপরিচিতার গলা কেন ধরিলে, উভয়েই যে ডুবিয়া মরিব। মেয়েটী বলিল তুই হেম না হয় বিনোদ, পর কেন? পর হলে কি আমায় ধরিতে জলে নামতে, কেহ ত আমাকে ধরে না। আমিও অনেক দিন জলে জঙ্গলে মাঠে ফিরিতেছি; আমি দেখিলাম এ খাটি পাগল। তখন আমি তাহাকে ধরিয়া ধরিয়া তীরে উঠিলাম। পাগলী আবার বলিল কথা কওনা কেন? তুমি হেম নও, তবে কি আমার মা? আমি বলিলাম আমি তোমার কেহ নই, তুমি কে? পাগলী আবার জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল, আমি তাহাকে কত বলিলাম কিছুই শুনিল না, জলে পড়িয়া ধীরে ধীরে সাঁতার দিতে দিতে গাইল—তেমন স্বর আর শুনি নাই,—'সবে মিলে গাওরে এখন, গাও তাঁরে যার যাঁরে নিখিল ভুবন।' গাইতে গাইতে পাগলী চলিল, আমি তীরে তীরে চলিলাম। আবার তাহার গীত থামাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম ওগো তুমি যাবে কোথা? পাগলী এবার হাসিল—গাইল 'যাব কলিকাতা সই, কলিকাতা পার কই।' সাঁতারিয়া দীঘি পার হইয়া পাগলী ঐ ঝোপের মধ্যে যাইয়া প্রবেশ করিল। আমি বাড়ী গিয়া দাদাকে সকল কথা বলিলাম; তিনি অমনি লোকজন লইয়া তল্লাস করিতে গেলেন।" বিনোদা,—"কেন তোমার দাদার যে এত মাথাব্যেথা পড়িল?" কুলদা,—"ঐ যে কুলীন পাড়ার মেয়েকে কি অষুধ দিয়ে পাগল করে দিয়েছে, তার জন্য এ দেশের কেনা খোঁজে? কুললক্ষ্মী বলিয়াই আমার দাদা এত খুঁজিলেন, পাইলেন না, কোথা যে পাগলী চলিয়া গেল ভাই দেবতা জানে।" বিনোদা—"ঠিক বোন ঐ কুললক্ষ্মী, তার কথা আমরা সব শুনিয়াছি। ও নাকি বনে বনে ঘুরিয়া বেড়ায়, কেহ ধরিতে পারে না। বিনোদ বাবু বলে নাকি তার কে আছে, তার কাছে যাবে বলিয়া নাকি পাগলী ছুটিয়াছে। আর শুনা যায় পাগলী অনেক দিন হইল একটা কৈবর্ত্তের ছেলেকে জলডুবি হইতে বাঁচাইয়াছিল। ছেলেটী পদ্মায় পড়িয়া যায়, পাগলী নাকি আপনার প্রাণ তুচ্ছ করিয়া ছেলেটাকে বাঁচায়। কিন্তু যেই সকল লোক জমিল, অমনি নদীতে সাঁতারিয়া কোথায় গেল, কেহ দেখিতে পাইল না।" রমণীগণ এইরূপ নানা আলাপ করিতে লাগিলেন।

বৃদ্ধাদের সন্ধ্যা সমাপন হইল, তাঁহারা যুবতীগণের প্রতি একবার

তীক্ষ্ণ দৃষ্টি করিলেন। তাহাতেই যুবতীগণের আর বুঝিতে বাকী রহিল না যে তাহাদের আর ঘাটে দাঁড়াইয়া আলাপ করা হইতেছে না। সকলে আপন আপন কলসী লইয়া চলিল। একটি যুবতী বলিল "বোন! তোদের সঙ্গে আমি চলতে পারি না, কাল সারাদিন কিছুই খাইতে পাই নাই, পিতা মাতা ও তিন বোন উপোস করিয়া দিন কাটাইয়াছি।" বিনোদা—"কেন গো তোদের না সে দিন স্বামী এসেছিল, এমন অবস্থার কথা তাঁরে বলিতে পারিলি না?" "বোন, সেইত অন্নকষ্ট ঘটাইয়া গিয়াছে, তিন বোনের এক স্বামী, ভাত কাপড় দিবে কি? পিতার যাহা কিছু ছিল, সকলি আমাদের বিবাহে গিয়াছে, এখন উপোস করিয়া প্রাণ যায়।" বিনোদা, "রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় যে উৎকৃষ্ট পথ দেখাইয়াছেন, সেই পথে যদি সকল কুলীন চলিত, তবে আর এ দেশ উচ্ছন্ন যাইত না, তোদের দুঃখ করিয়া মরিতে হইত না।" "বোন সে কথা আর বল না, এই জাঁটাজাঁটিতে কত সর্ব্বনাশ হইয়া যাইতেছে। তবু কি এ প্রথার সংশোধনে কেহ মন দেয়? রাসবিহারীর ন্যায় অভাগিনী কুলীনকন্যাদের বান্ধব যদি আর ২।৫ জন হইত, তবে কি আজ কুলীনসমাজের এত দুর্দ্দশা! তাহারা বৃথা কুলাভিমানের দাস হইয়া প্রকৃত ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিতেছে। সর্ব্বেশ্বর শর্ম্মার কথা কি শোন নাই, সে কথাত সমস্ত দেশময় রাষ্ট্র।" কুলদা—"ভাই তোমরা যদি সেই মেয়েটিকে দেখিতে পেতে, তবে না কাঁদিয়া থাকিতে পারিতে না, আহা কি নির্দ্দয় সমাজ, কি নির্দ্দয় পিতা!"

বিনোদা,—"ও পাড়ায় সেদিন কি কাণ্ড হয়েছে জান না? মুখুযো মহাশয়ের পাঁচ স্ত্রী, মধ্যম স্ত্রী স্বামী বশ করিবার জন্য পানে ভরিয়া এমনই এক অষুদ খাওয়াছিল যে তিন দিন ভেদ বমি হইয়া পূর্ব্ব পুরুষের ভাগ্যের জোরে মুখুযো মশায় প্রাণে বাঁচিয়াছেন।"

বিনোদ ও ললিত যেন সহস্র কর্ণে রমণীদের কথা শুনিতেছিলেন। রমণীগণের কথা আর শোনা যায় না, তাঁহারা অনেক দূর চলিয়া গিয়াছেন। ঘাটটী নীরব হইল, আলো নিবিয়া গেল। বাস্তবিক তখন অন্ধকারই হইয়াছিল। বিনোদ ললিতের হাত ধরিয়া ঘাটের সিঁড়িতে আসিয়া বসিলেন। ললিত বলিলেন "আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল, চল এখন কলিকাতা যাত্রা করি, অবশ্যই সরলাকে পাইব।" বিনোদ—"ঠিক কি, নদীতে ডুবিয়া মরিয়া থাকিলে কোথা পাবে? আমাকে কেন আর ত্যক্ত কর ভাই, তুমি কলিকাতা যাও, আমি যতদূর পারি খুঁজিয়া মরিব।" ললিত—"এখন আর এখানে বসিয়া লাভ কি? চল, বাড়ী যাই।" বিনোদ—"ভাই এই পুকুরে সাঁতারিয়া সরলা যে গানটী গাইয়াছিল, এস আমরাও তাহা গাইয়া

হৃদয় শীতল করি। উন্মাদ হৃদয়ও যে মহান পরমেশ্বরের নাম গাইয়া শীতল হইয়াছিল, আমার পাপ হৃদয় কি সেই মধুমাখা নামে জুড়াইবে না?" ললিত ভাবিল যথার্থ ঔষধ বটে, ব্যাকুল হৃদয়ে মহৌষধ ধর্ম্ম, বিপদে শোকে দুঃখে যে এই মহৌষধ সেবন করিতে পারে, সেই শীতল হয়। বিনোদের মনে সেই শান্তি বারি সেচনই আমার প্রধান কর্ত্তব্য। ললিত গাইল :—

"সবে মিলে গাওরে এখন, গাও তাঁরে গায় যারে নিখিল ভুবন।

বিহঙ্গ কাকলী করে,যাঁর নাম সুধা ক্ষরে, মোহিত গগনগিরি সুধাংশু তপন।

ছাড়ি মোহ কোলাহল,সে আনন্দ ধামে চল,শোন সে আনন্দধ্বনি, মুদিয়া নয়ন।

সেই পূর্ণ প্রাণেশ্বরে, জগত ভজনা করে, প্রেম নয়ন মেলি কর দরশন।"

বিনোদের চিত্ত অনেক সুস্থ হইল,তিনি বলিলেন "ললিত! এস সায়াহ্ন রাগিণীতে একটী গান করি। ললিত জয় জয়ন্তী রাগিণীর গীত আরম্ভ করিলেন :—

"গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপক জলে, তারকামণ্ডল চমকে মোতিরে। ধূপ মলয়ানিল, পবন চামর করে, সকল বনরাজি ফুলন্ত জ্যোতিরে।

কেমন আরতি হে ভবখণ্ডন তব আরতি, অনাহত শব্দ বাজন্ত ভেরিরে।"

বিনোদ ও ললিত পরমেশ চিন্তায় হৃদয়ের অপেক্ষাকৃত ধৈর্য্য সম্পাদন করিয়া বাড়ী চলিলেন।

পাঠিকাগণ, আজি এখানেই বিদায় লই। তোমরা আশা করিয়াছিলে, এ বারে কুলর সহিত তোমাদের সাক্ষাৎ করাইব, তাহা হইল না। আমার কি দোষ? যতদূর সাধ্য খুঁজিলাম, না পাইলে আমার সাধ্য কি? কিন্তু কুলর সহিত না হউক, আরও কত কুলীন কুমারীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। আর নিরুদ্দেশা রমণীর কিছু খবরত পাওয়া গিয়াছে। বিধাতা যদি অনুকূল হন, আরও খবর পাওয়া যাইতে পারে এবং আশা হয় কুললক্ষ্মীর সহিত সাক্ষাৎ হওয়া এককালে অসম্ভব না হইতে পারে।

পাক-বিদ্যা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শাকের ঘণ্ট।

শাক /১ সের, আলু, বেগুণ, কলাই, প্রভৃতি আধপোয়া, বড়ী /।০, একপোয়া, হরিদ্রা ১ মাষা, জীরে ১ তোলা, মরিচ ৫ মাষা, ধন্যা ১ তোলা, পিটলি ১ তোলা, নারিকেল কোরা ১তোলা, দুধ ৵০ ছটাক, চিনি /০ ছটাক, তেজপাতা ২ মাষা, লবঙ্গ ১ মাষা, গন্ধদ্রব্য ৪ মাষা,

ঘৃত /০ ছটাক, আদা ১ তোলা, লবণ ২ তোলা।

বড়ীগুলি ভাজিয়া একখানি পাত্রে রাখ। শাক ও সমুদায় তরকারিগুলি হরিদ্রাযুক্ত জলে একত্র সিদ্ধ কর। জল ফেলিয়া দিয়া শাক ও তরকারিগুলি পাত্রান্তরে রাখ। তেজপত্র, লবঙ্গ ও গন্ধদ্রব্য ব্যতিরেকে আর সমুদায় মসলা ঐ শাক ও তরকারির সহিত একত্র মাখ। বড়ীগুলিও উহার সহিত মিশ্রিত কর। পাকপাত্রে ঘৃত ঢালিয়া তেজপত্র ফোঁড়ন দিয়া ঐ মিশ্রিত শাক সম্বলন কর। সুপক্ক হইলে লবঙ্গ ও গন্ধদ্রব্য চূর্ণ দিয়া নামাও।

মোচার ঘণ্ট।

মোচার ফুল /১ সের, বড়ী /।০ এক পোয়া, হরিদ্রা ১ মাষা, জীরে ১ তোলা, মরীচ ৫ মাষা, ধন্যা ১ তোলা, ময়দা ১ তোলা, দুধ ৵০ ছটাক, চিনি /০ ছটাক, তেজপত্র ২ মাষা, গন্ধদ্রব্য ৪ মাষা, লবঙ্গ ৪ মাষা, আদা ১ তোলা, লবণ ২ তোলা, ঘৃত ৵০ ছটাক।

ফুলের কুচিগুলি সিদ্ধ করিয়া লইয়া শাকের ঘণ্ট রান্ধিবার প্রণালীতে পাক কর।

ইচঁড়ের ডাল্লা।

ইঁচড় /১ সের, ঘৃত /।০ এক পোয়া, দধি ।৵০ ছটাক, আদা ৪ তোলা, ধন্যা ২॥০ তোলা, লবণ ২॥০ তোলা, পিটলি ১ তোলা, মরিচ ৫ মাষা, লবঙ্গ ২ মাষা, গন্ধদ্রব্য ৪ মাষা, কুঙ্কুম ১ মাষা।

ইঁচড়খণ্ডগুলি জলে সিদ্ধ করিয়া জল ফেলিয়া দিয়া ইঁচড়গুলিতে আদার রস, দধি ও লবণ মাখ। হাঁড়িতে ঘৃত চড়াইয়া লবঙ্গ ফোঁড়ন দাও। দধি ও মশলা সমেত ইঁচড়গুলি হাঁড়িতে ঢালিয়া দিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেও। রস শুষ্কপ্রায় হইলে ধন্যা ও মরিচ দিয়া সুপক্ক কর। গলিয়া গেলে পিটলি দেও। কিঞ্চিৎ রস থাকিতে গন্ধদ্রব্য ও কুঙ্কুম দিয়া নামাও।

ছোলা ভিজনর সহিত ইঁচড় পাক করিতে ইচ্ছা হইলে অগ্রে কিঞ্চিৎ ঘৃত দিয়া ছোলাগুলি ভাজিয়া পাত্রান্তরে রাখিবে। পরে সম্বলনের সময় হাঁড়িতে দিবে।

আলুর দম।

ছাড়ান আস্ত আলু /১ সের, ঘৃত /।০ এক পোয়া, দধি /।০ এক পোয়া, পাকা তেঁতুল ২ তোলা, অথবা একটী পাতি লেবুর রস, বাদাম বাটা ৫ তোলা, ধন্যা বাটা ২ তোলা, লবণ ২ তোলা, মরিচ ৪॥০ মাষা, গন্ধদ্রব্য চূর্ণ ৪ মাষা, লবঙ্গচূর্ণ ২ মাষা।

সমুদয় দ্রব্য একত্র মাখিয়া পাকপাত্রে ঢাল। আচ্ছাদন দিয়া পাকপাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া উহার চারি পার্শ্ব ময়দার আঠা দ্বারা বন্ধ কর। একখানি কাঠের আগুনে মৃদু মৃদু তাপ দেও। দধি শুষ্ক হইয়া ঘৃতের ভুড় ভুড় শব্দ উঠিলে নামাও।

মৎস্য প্রলেহ।

ধৌত মৎস্যখণ্ড /১ এক সের, আলু বা কাঁচকলা /১ এক সের, ঘৃত /০ পোয়া, গন্ধদ্রব্য চূর্ণ ৪ মাষা, লবঙ্গ ২ মাষা, কুঙ্কুম ১ মাষা, কিশ্‌মিশ্‌ ৵০ ছটাক, বাদাম ৵০ ছটাক, ধন্যা ৪ তোলা, আদা ২ তোলা, চিনি /০ পোয়া ও লেবুর রস /।৵০ পোয়ার পানক।

মৎস্য খণ্ড গুলিতে কিঞ্চিৎ লবণ ও কিঞ্চৎ গন্ধ দ্রব্য চূর্ণ মাখিয়া দেড় ছটাক ঘৃতে লবঙ্গ ফোঁড়ন দিয়া সাঁতলাও। কদলী খণ্ড বা আলুর খণ্ড গুলি আধ ছটাক ঘৃতে সাঁতলাইয়া পরে উহাতে পানক ও কিশ্‌মিশ্‌ দিয়া মৎস্যের সহিত একত্র এক বার তাপ দাও। ধন্যা, বাদাম, দধি ও পিটলি দেও, সুপাক হইলে গন্ধ দ্রব্য চূর্ণ ও অবশিষ্ট ঘৃত দিয়া নামাও।

রোহিত মৎস্যের বিশেষ প্রলেহ।

রোহিত মৎস্য /১ এক সের, ঘৃত /।০ এক পোয়া, ছোলার বেসন /।০ পোয়া, গন্ধ দ্রব্য চূর্ণ ৪ মাষা, লবঙ্গ ২ মাষা, মরিচ ৪॥০ মাষা, ধন্যা ৪ তোলা, কুঙ্কুম ২ মাষা, দধি ৵০ ছটাক, লবণ ২ তোলা। মৎস্যের আঁইস ছাড়াইয়া এবং ডানা পুচ্ছ কাটিয়া অখণ্ড মৎস্য বালুকাপূর্ণ হাঁড়িতে পাক কর। পাকান্তে নামাইয়া মৃত্তিকার প্রলেপ খসাইয়া কিঞ্চিৎ জলদ্বারা ধৌত কর। সাবধানে মাছের মাংস ভাগ হইতে কাঁটা বাছিয়া ফেল। বেসন ও কিঞ্চিৎ গন্ধ দ্রব্য চূর্ণ ঐ মৎস্যের উপর প্রক্ষেপ করিয়া হাতা দ্বারা উত্তম রূপ মিশ্রিত করিয়া খাসা প্রস্তুত কর। ঐ খাসা দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য নির্ম্মাণ কর, পরে হাঁড়িতে ঘাস বিছাইয়া জল দিয়া ঐ মৎস্যগুলি পাক করিয়া দৃঢ় কর। কড়াতে ঘৃত ঢালিয়া লবঙ্গ ফোঁড়ন দিয়া ঐ মাছ গুলি সাঁতলাও। সাঁতলান হইলে জলে ধন্যা মরিচ ও লবণ গুলিয়া উহাতে দেও। সুসিদ্ধ হইলে বাদাম, পিটলি, গন্ধ দ্রব্য ও কুঙ্কুম বাটা এবং দধি দিয়া নামাও।

ওলকপি ও মোচা চিংড়ীর প্রলেহ।

ওলকপি /১ সের, মোচা চিংড়ী /১ সের, ঘৃত /।০ পোয়া, আদা ২ তোলা, ধন্যা ২ তোলা, লবণ ৪ তোলা, মরিচ ৬ মাষা, জীরে ৪ মাষা, গন্ধদ্রব্য ৫ মাষা, লবঙ্গ ২ মাষা, কুঙ্কুম ২ মাষা, তেজপত্র ৪ খান।

কপি ও মৎস্য প্রত্যেক দ্রব্য এক এক ছটাক ঘৃতে পৃথক্ সন্তলন কর। আদা, জীরে, মরিচ, তেজপত্র ও লবণ অল্পজলে গুলিয়া তদ্দ্বারা কপি ও মৎস্যগুলি সিদ্ধ কর। সুপক্ক হইলে অবশিষ্ট ঘৃতে লবঙ্গ ফোঁড়ন দিয়া সমুদায় ব্যঞ্জন সন্তলন কর। ধন্যা, কুঙ্কুম ও গন্ধদ্রব্য চূর্ণ দিয়া ৫ মিনিট পরে নামাও।

মাচের দম।

ধৌত মৎস্য খণ্ড /১ সের, ঘৃত /।।০

অর্দ্ধসের, দধি /॥৹ আধসের, পাকা তেঁতুল ২ তোলা, বাদাম ৫ তোলা, ধন্যা ২ তোলা, লবণ ২ তোলা, মরিচ ৫ মাষা, গন্ধ চূর্ণ ৪ মাষা। মৎস্য খণ্ড গুলিতে তেঁতুল মাখিয়া আধ ঘন্টা রাখ। পরে উপরি উক্ত সমুদায় দ্রব্য একত্র মিশাইয়া পাকপাত্রের মধ্যে রাখিয়া পাত্রান্তর দ্বারা আচ্ছাদন কর। আচ্ছাদন পাত্রের চারি দিকের ছিদ্র স্থান ময়দার আটা দ্বারা রুদ্ধ কর। একখানি কাষ্ঠে মৃদু মৃদু জাল দাও। প্রথমে পট্ পট করিয়া শব্দ হইবে। অনুমান ২ ঘন্টা পরে ভুড় ভুড় শব্দ হইলে নামাও।

মাচের বড়া ভাজা।

মাচ সিদ্ধ করিয়া বেসন বা ডাইল বাটার সহিত মিশ্রিত কর। বড়া করিয়া তৈলে ভাজিয়া লও।

ডিম্ব প্রলেহ।

ডিম্ব একসের, জীরে এক তোলা, মরিচ এক তোলা, আদা এক তোলা, ধন্যা এক তোলা, গন্ধ দ্রব্য চারি মাষা, লবঙ্গ এক মাষা, লবণ তিন তোলা, দধি এক পোয়া, ঘৃত দুই ছটাক, কুঙ্কুম দুই মাষা।

ডিম্বগুলি সিদ্ধ করিয়া খোলা ছাড়াও। প্রত্যেক ডিম্ব দুই খণ্ড করিয়া কর্ত্তন কর। ঐ ডিম্ব খণ্ড গুলি ঘৃত লবঙ্গে সন্তলন করিয়া উহাতে জীরে মরিচ, আদা, ধন্যা, লবণ, দধি ও কিঞ্চিৎ জল দিয়া সিদ্ধ কর। সুসিদ্ধ হইলে কুঙ্কুমবাটা দিয়া ও দুই মিনিট পরে গন্ধ দ্রব্য চূর্ণ দিয়া নামাও।

তাপ সম্বন্ধে কয়েকটী কথা।

পরমাণুসকলের গতি বা চঞ্চলতা হইতে তাপের উৎপত্তি হয়। তাপের বিপরীত শৈত্য। পরমাণুসকল যত স্থির ভাব ধারণ করে, ততই শৈত্যের আধিক্য হয়। তাপ ও শৈত্য আপেক্ষিক অর্থাৎ অল্লাধিক পরিমাণে সকল বস্তুতেই আছে, ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে থাকাতে বস্তুর ঘন, তরল ও বায়বীয় এই তিন অবস্থা উৎপন্ন হয়। ঘন বস্তুতে তাপের অল্পতা ও শৈত্যের আধিক্য, তরলে উভয়ের সমতা এবং বায়বীয় পদার্থে তাপের আধিক্য। তাপদ্বারা পরমাণুসকলের প্রসারণ ও শৈত্য দ্বারা সঙ্কোচন হইয়া থাকে। প্রসারিত হইলে বস্তুর ভার কমিয়া যায় ও সঙ্কুচিত হইলে ভার বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

তাপের নূতন সৃষ্টিও হয় না, নাশও হয় না। পরমাণুসকলের গতি দ্বারা তাপের স্থানান্তর হয় মাত্র। যখন অগ্নি উদ্দীপিত হয় বা কোন বস্তু তপ্ত হয়, তখন বাষ্প চলে বা বস্তুসকলের অন্তর্গত ছিদ্রসকলের মধ্যে বিচরণ করে। পৃথিবীতে যখন শীত হয়, তখন তাহার

কারণ এই যে তাপ যে পরিমাণে জমে, তদপেক্ষা তাহার ব্যয় অধিক হয়। গ্রীষ্মকালে ইহার বিপরীত। পৃথিবীর অর্দ্ধভাগে যখন শীত, অপরার্দ্ধে তখন গ্রীষ্ম।

অগ্নি প্রথমে কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা অসভ্য লোকদিগের কার্য্য দেখিয়া বিলক্ষণ বুঝা যায়। তাহারা দুই খণ্ড কাষ্ঠ বা প্রস্তর সজোরে ঘষিয়া আগুন বাহির করে। কামারেরাও আগুন না পাইলে কখন কখন একটী প্রেকে ৫।৬ বার হাতুড়ীর ঘা দিয়া আগুন নির্গত করে। জগতে এমত পদার্থ নাই, যাহাতে তাপ নাই। বরফ যে এমত শীতল, তাহারও দুই খণ্ড পরস্পরের সহিত ঘষিলে তপ্ত হইয়া গলিয়া যায়। কাউন্ট রমফোর্ড জলে কামান থামিয়া তাহা এরূপ উত্তপ্ত করেন, যে তাহাতে মাংস পাক হয়। প্রথম ঘণ্টায় জলের তাপ ৬০ হইতে ১৭০ ডিগ্রীতে উঠে, আর দেড় ঘণ্টায় জল ফুটিতে থাকে। ৯টা মোমবাতী একত্র জ্বালিলে যে ফল হয়, ইহাতেও তাহাই হইয়াছিল। আঘাত ও ঘর্ষণই সামান্যতঃ তাপ প্রকাশের কারণ। একটী লৌহপাত্রের উপর হাতুড়ীর ঘা দিয়া জল দিলে তাহা বাষ্প হইয়া উড়িয়া যাইবে।

তাপ সকল বস্তুতে সমান পরিচালিত হয় না—স্বর্ণ, রৌপ্য ও তামাতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়, তাহার নীচে অন্যান্য ধাতুতে, তৎপরে প্রস্তরে, তৎপরে ইট, কাচ, কয়লা ইত্যাদিতে; পালক, রেশম, পশম, চুল ও জলে সর্ব্বাপেক্ষা কম, এই জন্য শেষোক্ত পদার্থদিগকে অপরিচালক বলে।

তাপ ও আলোক একই পদার্থ, আলোকে গতির প্রকাশ অধিক। বিদ্যুদালোক ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

জল তাপের ২১২ ডিগ্রী বা মাত্রা পর্য্যন্ত তাপ বহন করিতে পারে, তাহার অধিক হইলে বাষ্পাকৃতি ধারণ করিয়া উর্দ্ধগামী হয়, বাতাস আর তাহাকে চাপিয়া রাখিতে পারে না।

এক মিনিটে মানুষ ২০ বার নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলে, ইহাই শরীরের তাপোৎপত্তির কারণ। এক মিনিটে মানুষ ৩৩ ঘন বুরুল বায়ু আত্মসাৎ করে, তন্মধ্যে ২৮ বুরুল অম্লজন অঙ্গারক বাষ্প হইয়া যায়।

জ্বলন—তিনটী বস্তুর সহযোগে হইয়া থাকে। জলজন ও অম্লজন যোগে কোন বস্তুর অঙ্গারক উপাদান যখন নষ্ট হয়, তখন তাহা ধূম ও অগ্নিশিখা রূপে বহির্গত হয়। একটী বাতীর জলজন বাষ্পকে উঠাইয়া অন্য আলোদ্বারা তাহাকে জ্বালা যায়। বায়ুমণ্ডলের অম্লজন তাপের সহিত যোগ দিয়া আরও জলজন উঠাইয়া দেয়, যতক্ষণ জলজন ও অম্লজনে মিলিত হইতে পারে, ততক্ষণ জ্বলন ক্রিয়া চলিতে থাকে। ১ পাউণ্ড জলজন ও ৬ পাউণ্ড অম্লজন ৩৫০ পাউণ্ড বরফ গলাইয়া থাকে। জলীয় বাষ্প

২১২ ডিগ্রী হইতে বরফে পরিণত হইলে তাহা হইতে ৯৫০ ডিগ্রি তাপ বাহির হইয়া ইহার সমান পরিমান জলকে উত্তপ্ত করে। ভিন্ন ভিন্ন পদার্থে আগুনের আঁচ কত ভিন্ন ভিন্ন, তাহা নিম্নলিখিত বিবরণে জানা যায়ঃ—

আধসের কোল বা পাথুরিয়া কয়লা ৪৫ সের বরফ গলায়।

"	কোক	৪৭	"
"	কাঠ	২৬	"
"	কাঠের কয়লা	৪৭॥০	"
"	পিটকয়লা	৯॥০	"

ঢোঁড়ারাম।

এ সংসারে ফুল বৃথায় ফোটে না। রম্য কাননেই ফুটুক, আর নির্জন বন-প্রদেশেই ফুটুক, কিম্বা বালুকারণ্যের মরুদ্বীপের কোন সীমান্ত দেশেই ফুটুক, আপনার সুগন্ধ আপনার সৌন্দর্য্য যথাসাধ্য বিস্তার করিবেই করিবে। ঐ যে দুঃখিনী অন্নাভাবে শীর্ণকায়া, যদি উহার হৃদয়ে দয়া থাকে, তবে উহার দ্বারা জগতের তেমনি উপকার হইবে, রাজশ্রী-সম্পন্না মহারাণী দ্বারা যেরূপ হইতেছে! কাহারও কথা গেজেটে উঠিল, কাহারও কথা অন্ধকারে ঢাকা থাকিল এই মাত্র প্রভেদ! জগতের উপকারিতা অপকা-রিতার কিছু ইতর বিশেষ নাই। ওই যে একটী নাম প্রস্তাবের শিরোভাগে রহিয়াছে, ভদ্রসমাজে অজ্ঞাত, পড়িতে কট মট, জাতিতে বিহারী চাষা, নিরক্ষর ভিক্ষোপজীবী—উহার সাধুতা এবং দয়ায় এ সংসারের কি উপকার হইয়াছে শুনিবে?

বহুদিন অতিবাহিত হয় নাই, ঢোঁড়া-রাম কলিকাতার অনতিদূরস্থ এঁড়দেহ নামক গ্রামে, কায়িক পরিশ্রমে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। যখন অতিরিক্ত কায়িক শ্রম ঢোঁড়ারামের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল, যখন যে দুই চারি মুঠা অন্ন নিতান্ত না হইলে নয় তাহারও সংস্থান করিতে হইলে তাহাকে সারাদিন খাটিয়া মরিতে হইত, সেই সময়ে একদিন হঠাৎ সে রাস্তার ধারে একজন রোগজীর্ণ খোঁড়া ভিক্ষুককে দেখিল! ভিক্ষুক অনাহারী অকর্ম্মণ্য, কে তাহাকে দয়া করিবে? ইংরেজি সভ্যতা এদেশ হইতে যত ধন রত্ন অপ-হরণ করিয়াছে, তাহার মধ্যে দয়া দাক্ষিণ্য একটা প্রধান। আজ অর্থ ব্যবহার শাস্ত্রের দোহাই দিয়া আমরা দ্বারের ভিক্ষুককে তাড়াইয়া দি। ধনী ভদ্রলোকে গ্রাসপূর্ণ; কিন্তু ঐ দুঃখী ভিক্ষুকের দুরবস্থা দেখিয়া কে কাতর? কাহার উদ্বৃত্ত হাঁড়ি হাঁড়ি অন্নের নগণ্য এক মুষ্টি উহার উদরপূর্ত্তির জন্যে ব্যয়িত